প্রকাশনার ৮২ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ২৮ ৭-১৩ আগস্ট, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

আদিবাসীদের ক্ষুদ্র নৃ-জনগোষ্ঠী ভাবতে সময় লেগেই যাবে

ভালো নেই সিলেটঁর আদিবাসীরা

বন্ধু দিবসের ইতিকথা

বন্ধু-বন্ধুত্ব

বন্ধু তোমার আমার

শোকবার্তা

পল রোজারিও

জন্ম: ফেব্রুয়ারি ২, ১৯৩০
মৃত্যু: মে ৮, ২০১৫
গ্রাম: ছাইতান, নাগরী
কালীগঞ্জ, গাজীপুর

কামিনী থেকলা রোজারিও

জন্ম: ফেব্রুয়ারি ২১, ১৯৩৫
মৃত্যু: আগস্ট ১১, ২০২১
গ্রাম: ছাইতান, নাগরী
কালীগঞ্জ, গাজীপুর

মা, দেখতে দেখতে একটি বছর পেরিয়ে গেল, আজও মনে হয় তুমি আছো আমাদের মাঝে। **বাবা,** সাতটি বছর ধীর গতিতে চলে গেলেও বেঁচে আছো তুমি আমাদের মাঝে। তোমাদের অনুপস্থিতি হৃদয়ে বিশাল শূন্যতা অনুভব করায়, এককীত্বের বিষাদ চেপে ধরে। তোমাদের দিয়ে যাওয়া শিক্ষা ও আদর্শ চিরদিন আমাদের চলার পথের সঙ্গী হয়ে থাকবে। স্বর্গধাম থেকে আশীর্বাদ করো, আমরা যেন তোমাদের মত আদর্শবান, খ্রিস্টীয় জীবন যাপন করতে পারি ও উদার মনের মানুষ হতে পারি। পরম পিতার কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন তোমাদের অনন্ত শান্তি দান করেন।

তোমাদের প্রিয় মেয়েরা: স্মৃতি, প্রীতি, লিপি ও লিলি।
নাতি: মার্সেলিনো, বাপ্পি, ইয়েন ও ম্যাক।
নাতনী: ক্যাথরিন ও কলি।
নাতিন-জামাই: রিচার্ড

বিজ্ঞ/২১৬/২২

তোমরা ছিলে, আছো এবং থাকবে মোদের হৃদয় মাঝারে

আগ্নেশ রোজারিও

জন্ম : ৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ৯ আগস্ট, ২০১২ খ্রিস্টাব্দ
দক্ষিণ পানজোরা, নাগরী ধর্মপল্লী

এ বিশ্ব জগত সংসারে তোমাদের উপস্থিতিতে আমরা ছিলাম শান্তিতে স্বস্তিতে ও স্নেহাশ্রয়ে। সময়ের আবর্তে শত কর্মব্যস্ততায় কেটে গেছে বেশ কয়েকটা বছর। **মা ও বাবা** যেদিন আমাদের কাঁদিয়ে সব ভাইবোনকে শোক সাগরে ভাসিয়ে দিয়ে তোমরা চলে গেলে পরম পিতার কোলে। মা ও বাবা তোমরা আমাদের কাছে নেই, তবুও মনে হয় এইতো সেদিন তোমরা আমাদের মাঝে ছিলে হাসি আনন্দে। জান মা-বাবা মাঝে মাঝে মনে হয় যদি একটু তোমাদের স্নেহ, আদরের ছায়ায় যেতে পারতাম খুবই তৃপ্তি পেতাম। মা ও বাবা তোমাদের খুব miss করি।

ক্লেমেন্ট গমেজ

জন্ম : ২৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ২ ফেব্রুয়ারি, ২০১০ খ্রিস্টাব্দ
দক্ষিণ পানজোরা, নাগরী ধর্মপল্লী

আশীর্বাদ কর মা ও বাবা আমরা যেন তোমাদের আদর্শ, প্রার্থনাময়তা, আন্তরিকতা, নম্রতা, দয়া ও ত্যাগস্বীকার ও কঠোর কর্মময় জীবন অনুসরণ করে সকল কাজে পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারি।
পরম পিতার কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন তোমাদের অনন্ত শান্তি দান করেন।

পরিবারের পক্ষে —

মেয়ে ও মেয়ে জামাই : পুষ্প-প্রয়াত অমিয়, জয়ন্তী-কর্নেল
ছেলে ও ছেলে বউ : সুবাস-সবিতা, বিলাস-স্বপ্না, রিচার্ড-ইভা
ছেলে : ব্রাদার প্রদীপ প্লাসিড গমেজ সিএসসি
নাতি-নাতনী : সীমা, লিমা, লিজা, পরিনীতা, অমিত, শিভন, জেইডেন, তনয়, মিশেল, সুইডেন ও স্তুতি

বিজ্ঞ/২১৭/২২

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮২, সংখ্যা : ২৮
০৭ - ১৩ আগস্ট, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ
২৩ - ২৯ শ্রাবণ, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড
ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়
সুনীল পেরেরা
শুভ পাস্কাল পেরেরা
পিটার ডেভিড পালমা

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি
ইন্টারনেট

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন
মেরী তেরেজা বিশ্বাস
লিটন ইসাহাক আরিন্দা

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স
দীপক সাংমা
নিশুতি রোজারিও
অংকুর আন্তনী গমেজ

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক
চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫
E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com
Visit: www.weekly.pratibeshi.org

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সম্পাদকীয়

বন্ধুত্বের বন্ধনে রাখি আদিবাসীদের

মানব জীবনের মধুরতম সম্পর্কগুলোর মধ্যে 'বন্ধুত্ব' অন্যতম। বন্ধুত্বকে কেউ কেউ আখ্যায়িত করে বলে থাকেন দু'টি দেহে একটি আত্মা। যদিও সাধারণত দু'টি দেহে দুটি প্রাণ বা দু'টি আত্মাই থাকে। কিন্তু দু'টি প্রাণ বা আত্মা যখন একাত্ম হয়ে যায় তখনই প্রকৃত বন্ধুত্ব সৃষ্টি হয়। সমমনা দুজন মানুষের একটি জগৎ থেকেই শুরু হয় বন্ধুত্ব। বন্ধুত্বে সর্বাবস্থায়ই থাকবে আস্থা, বিশ্বাস ও নির্ভরতা।

প্রত্যেক মানুষের জন্যই একজন ভাল বন্ধু থাকা প্রয়োজন। কারণ একজন ভাল বন্ধুই জীবনে সামনের দিকে এগিয়ে চলতে সার্বক্ষণিক সাহায্য করে। যেমনটি যিশু প্রকৃত বন্ধু হয়ে আমাদেরকে ঈশ্বরের দিকে চালিত করতে ও মুক্তি দিতে নিজের প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন। যিশু বন্ধুত্বের সম্পর্কটিকে মহিমান্বিত করেছেন। তিনি তাঁর শিষ্যদের বলেন, আমি তোমাদেরকে আর দাস বলছি না। তোমরা আমার বন্ধু। বন্ধুর জন্য প্রাণ দেওয়ার চেয়ে বড় ভালোবাসা আর কি হতে পারে? যিশু আমাদের প্রকৃত বন্ধু বলেই আমাদের জন্য প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন। আসলে প্রকৃত বন্ধুত্বের জন্য দরকার অকৃত্রিম ভালবাসা ও আত্মত্যাগ। নিজ স্বার্থকে বড় করে দেখলে কখনো প্রকৃত বন্ধুত্ব গড়ে উঠতে পারে না। যে বন্ধু সুখ-দুঃখে সহমর্মিতা প্রকাশ করে, বিপদে সহায়তা করে, দ্বিধাগ্রস্ত অবস্থায় সুপরামর্শ দেয়, ভুল পদক্ষেপ থেকে বিরত থাকতে সহায়তা করে, বন্ধুত্ব নষ্টের ভয়ে ভীত না হয়ে প্রয়োজনের মুহূর্তে সত্য উচ্চারণ করে আলোর পথ দেখায় সে-ই প্রকৃত বন্ধু। একজন প্রকৃত বন্ধু পাওয়া ঈশ্বরের বিশেষ দান। যিশু আমাদের প্রকৃত উত্তম বন্ধু। উত্তম বন্ধু যিশুর দিকে তাকিয়ে আমার ভেতরকার বন্ধুর স্বরূপ আবিষ্কার করতে হবে। ভণ্ড বন্ধুত্বের প্রবণতা থাকলে তা বাদ দেবার আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে।

বন্ধুত্বের বৈশিষ্ট্যগুলোর সাথে আদিবাসীদের বৈশিষ্ট্যের অনেক মিল। সহজ-সরলতা, অকপটতা, হাসি-খুশি, প্রাণবন্তময়তা ও উচ্ছলতা যেমনি বন্ধুত্বকে গাঢ় করে তেমনি এগুলো আদিবাসীদেরকে তাদের স্বরূপ চিনতে সহায়তা করে। কেননা এসকলগুণাবলী তাদের চরিত্রের সাথে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। ৯ আগষ্ট বিশ্ব আদিবাসী দিবসে আদিবাসীদেরকে সম্মান-শ্রদ্ধা দেখিয়ে যেমনি স্মরণ করা হয় ঠিক একইভাবে আদিবাসীগণও তাদের প্রকৃত স্বরূপ ও শিক্ষা সমুজ্জ্বল রাখার প্রত্যয় রাখুক। এবছর বিশ্ব আদিবাসী দিবসের মূল প্রতিপাদ বিষয় হলো: 'The role of indigeneous Women in the preservation and transmission of Traditional knowledge অর্থাৎ ঐতিহ্যগত বিদ্যা সংরক্ষণ ও বিকাশে আদিবাসী নারী সমাজের ভূমিকা'। বেশ কয়েকটি আদিবাসী নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী মাতৃতান্ত্রিক হওয়ায় তাদের কাছে ঐতিহ্যগত বিদ্যা সংরক্ষণ সহজ। কেননা মায়েরা সহজেই সন্তানদের তাদের পরিবার ও সমাজের মূল্যবোধ শিক্ষা দেন। বিশেষভাবে সহজ-সরলতা ও পরস্পরের পাশে থাকার শিক্ষা আদিবাসীরা মায়ের কাছ থেকেই শিখেন। তবে আদিবাসীরা সহজ-সরল হওয়াতে অনেকেই তাদেরকে ঠকান, শোষণ-নির্যাতন ও প্রবঞ্চনা করেন। সরকার বর্তমানে কিছুটা নজর দিলেও এখনও নানারূপ বঞ্চনার শিকার বাংলাদেশের আদিবাসীরা। তারা আদিবাসী নামেই পরিচিত হতে পছন্দ করেন যদিও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী বলে তাদেরকে চিহ্নিত করা হচ্ছে।

আদিবাসীদের কৃষ্টি-সংস্কৃতি, মূল্যবোধ, ভাষা, ভাললাগা, জীবন নির্বাহের ধরণ-ধারণ বিষয়গুলোকে নষ্ট করলে আমাদের আচরণ কেমন হওয়া উচিত তা পোপ ফ্রান্সিস কানাডার আদিবাসীদের কাছে ক্ষমা চেয়ে তাঁর গভীর বেদনার কথা তুলে ধরে বিশ্বকে বুঝিয়ে দিয়েছেন। আদিবাসীরা তাঁর হৃদয়ের ভাষা বুঝে তাঁকে জড়িয়ে ধরেছেন, হাততালি দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন তাদের সরলতা নির্মলতা। প্রতিদান প্রতিশোধে নয় ভালোবাসায়। আমরা স্বার্থবাদী কিছু মানুষ ক্ষমা চাওয়াকে কাপুরুষতা ভাবি আর দণ্ড ছাড়া ক্ষমা দেওয়াকে অর্থহীন মনে করি। কানাডার আদিবাসীরা আমাদের ভ্রান্ত ধারণা ভেঙ্গে দিয়ে বন্ধুত্ব রক্ষায় সরলতা ও ক্ষমার প্রাধান্যকে তুলে ধরেছেন।

অনেক আদিবাসী খ্রিস্টান নারী ভুল বন্ধুত্বকে ঠিক মনে করে অন্যধর্ম ও গোষ্ঠীর ব্যক্তিকে জীবনসঙ্গী করে সুখী হতে গিয়ে বার বার ঠকছেন। তাই ছলনাময় বন্ধুত্বকে চিহ্নিত করে তা থেকে বিরত থাকতে হবে। সরলপ্রাণ আদিবাসীদের বন্ধুত্বকে এবং দেশ ও জাতি গঠনে তাদের অবদানকে সবাই শ্রদ্ধা করুক। †

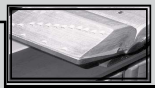

পরে তিনি নিজের শিষ্যদের বললেন,'এ জন্যই আমি তোমাদের বলছি, কী খাব বলে প্রাণের বিষয়ে, কিংবা কী পরব বলে শরীরের বিষয়ে চিন্তিত হয়ো না। কারণ খাদ্যের চেয়ে প্রাণ ও পোশাকের চেয়ে শরীর-ই বড় ব্যাপার। - ***(লুক: ১২:২২-২৩)***

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

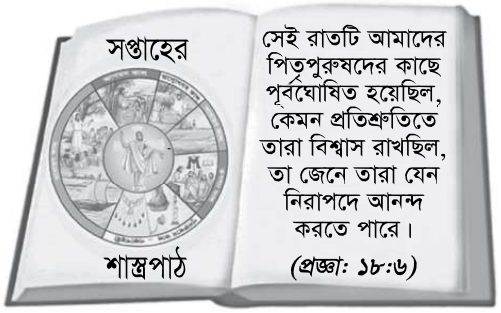

সেই রাতটি আমাদের পিতৃপুরুষদের কাছে পূর্বঘোষিত হয়েছিল, কেমন প্রতিশ্রুতিতে তারা বিশ্বাস রাখছিল, তা জেনে তারা যেন নিরাপদে আনন্দ করতে পারে।

(প্রজ্ঞা: ১৮:৬)

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ৭ - ১৩ আগস্ট, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

৭ আগস্ট, রবিবার
প্রজ্ঞা ১৮: ৬-৯, সাম ৩৩: ১, ১২, ১৮-২০, ২২, হিব্রু ১১: ১-২, ৮-১৯ (সংক্ষিপ্ত ১১: ১-২, ৮-১২), লুক১২: ৩২-৪৮ (সংক্ষিপ্ত ১২: ৩৫-৪০)

৮ আগস্ট, সোমবার
সাধু ডমিনিক, যাজক
এজে ১: ২-৫, ২৪-২৮, সাম ১৪৮: ১-২, ১১-১৪, মথি ১৭: ২২-২৭

৯ আগস্ট, মঙ্গলবার
ক্রুশভক্তা সাধ্বী তেরেজা বেনেডিক্ট, কুমারী ও সাক্ষ্যমর
এজে ২: ৮-৩: ৪, সাম ১১৯: ১৪, ২৪, ৭২, ১০৩, ১১১, ১৩১, মথি ১৮: ১-৫, ১০, ১২-১৪

১০ আগস্ট, বুধবার
সাধু লরেন্স, ডিকন ও ধর্মশহীদ, *পর্ব*
সাধু-সাধ্বীদের পর্বদিবসের বাণীবিতান:

২ করি ৯: ৬-১০, সাম ১১২: ১-২, ৫-৯, যোহন ১২: ২৪-২৬

১১ আগস্ট, বৃহস্পতিবার
সাধ্বী ক্লারা, কুমারী
এজে ১২: ১-১২, সাম ৭৬: ৫৬-৫৯, ৬১-৬২, মথি ১৮: ২১--১৯: ১
অথবা *সাধু-সাধ্বীদের পর্বদিবসের বাণীবিতান:*
হোসেয়া ২: ১৬-১৭, ২১-২২, সাম ৪৫: ১০-১১, ১৩-১৬, লুক ১৪: ২৫-৩৩

১২ আগস্ট, শুক্রবার
সাধ্বী জেন ফ্রান্সেস দ্য শন্টাল, সন্ন্যাসব্রতী
এজে ১৬: ১-১৫, ৬০, ৬৩ (বিকল্প: এজে ১৬: ৫৯-৬৩), গীতিকা ইসা ১২: ২, ৪-৬, মথি ১৯: ৩-১২

১৩ আগস্ট, শনিবার
সাধু পন্‌শিয়ান, বিশপ **এবং সাধু হিপ্পোলিটো**
এজে ১৮: ১-১০, ১৩, ৩০-৩২, সাম ৫১: ১০-১৩, ১৬-১৭, মথি ১৯: ১৩-১৫

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

৭ আগস্ট, রবিবার
+ ১৯৩০ সিস্টার এম. আলবার্টিন আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৬৬ ফাদার যাকোব এস গমেজ ভুরা (ঢাকা)
+ ২০০৬ ফাদার জি. এম তুরঁজো সিএসসি
+ ২০১৬ সিস্টার মেরী করুণা এসএমআরএ (ঢাকা)

৮ আগস্ট, সোমবার
+ ১৯৭৩ সিস্টার সেত-দুলর দঁদুরঁ সিএসসি

৯ আগস্ট, মঙ্গলবার
+ ১৯২২ সিস্টার এম ইউফ্রোসিন আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ২০১৪ সিস্টার এম জেমস দেশাই আরএনডিএম (ঢাকা)

১০ আগস্ট, বুধবার
+ ১৯৫৩ ফাদার মাথিয়াস জে ওসভাল্ড সিএসসি (ঢাকা)
+ ২০২১ ফাদার আলফ্রেড গমেজ (ঢাকা)

১১ আগস্ট, বৃহস্পতিবার
+ ১৯৪৫ সিস্টার এম ইউফ্রেজিয়া গ্রিফিন সিএসসি
+ ১৯৬০ ফাদার বেনিতো রোতা এসএক্স (খুলনা)
+ ২০০১ সিস্টার মেরী বার্ণার্ড এমসি (ঢাকা)

১২ আগস্ট, শুক্রবার
+ ১৯৬০ ব্রাদার যোসেফ কিসুম (দিনাজপুর)

১৩ আগস্ট, শনিবার
+ ১৯৪৩ সিস্টার এম কলম্বা ক্ল্যাসি সিএসসি
+ ১৯৮০ ফাদার চেস্টার স্লাইডার সিএসসি (ঢাকা)

করোনা কিন্তু শেষ হয়ে যায়নি

কিছুদিন আগে এক শুক্রবার ছিলো আমার অতি প্রিয় তুমিলিয়া মিশনের প্রতিপালক দীক্ষাগুরু সাধু যোহন বাপ্তিস্ত এর শুভ জন্মদিন অর্থাৎ আমাদের মিশনের পার্বণ। তাই আগের দিন বৃহস্পতিবার সকালে বাড়ির পথে রওনা হলাম ফার্মগেট হতে বিআরটিসি বাসে চড়ে। কিন্তু আমি হতাশ হলাম। বাসে মোট যাত্রী ৩২ জন সেখানে এত বলার পরও মাস্ক পরা ছিলাম আমি সহ মাত্র ৬ জন। অন্যদের দেখে মনে হলো, ঘাতক করোনা বিন্দুমাত্র বাংলাদেশে নেই।

অথচ কিছুদিন আগেই হাজারের উপর আক্রান্ত হচ্ছে করোনা রুগী বাংলাদেশে এবং সরকারের তরফ হতে এই ব্যাপারে বেশ সতর্ক সংকেত দেওয়া হচ্ছে প্রতিদিন। কিন্তু আমি আপনি আমরা তার কোন গুরুত্ব দিচ্ছি না ও মাস্ক পরিধানসহ বিভিন্ন বিধিনিষেধ মানছি না।

বাংলাদেশ সরকারের তরফ হতে ঘোষণা দেওয়া হচ্ছে কিছু দিনের মধ্যে ৫ হতে ১২ বছরের শিশুদেরও করোনার টিকা দেওয়া হবে। করোনা কিন্তু ঘাতক ছোঁয়াচে মরণব্যাধি। এই ঘাতকের কাছে ইতিমধ্যে তরতাজা প্রাণ গেছে প্রায় ৬৫.০০,০০০ লাখ মানুষের।

করোনার চতুর্থ ঢেউ সামলাতে WHO সহ বিভিন্ন দেশ যখন নিজেদের ঘুম হারাম করছে সেখানে আমাদের যেন একদম কোন ডরভয় নেই নিষ্ঠুর করোনাকে দেখে। করোনা যাদের ধরে তারাই শুধু তিলে তিলে বুঝতে পারে করোনা তাদের শরীরের কত ক্ষতি করে গেছে। করোনার বিভীষিকাময় কষ্ট হতে নিজের জীবন বাঁচানোর দায়িত্ব কিন্তু আমাদের নিজেদের।

করোনার মরণ ফাঁদ হতে নিজেকে বাঁচাতে সরকার ঘোষিত পূর্বের সকল বিধিনিষেধ আমাদের অক্ষরে অক্ষরে মানতে হবে। বিশেষ করে ঘরের বাহির হলে মাস্ক পড়া, কিছু ধরলে হাত পরিষ্কার করে ধোয়া, সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা, যেখানে সেখানে নোংরা না করা, হাঁচি-কাশি সাবধানে দেওয়া নিয়মিত করতে হবে। করোনাকে ভয় নয়, প্রয়োজন সচেতনতার সাথে সকল বিধিনিষেধ কথায় ও কাজে মেনে চলে করোনার ভয়কে জয় করার সঠিক সিদ্ধান্ত ও তা পালনে সবাইকে সজাগ করা। আসুন করোনার মরণকামড় হতে বাঁচতে নিজে সচেতন হই পাশের লোককে সচেতন করি!!!

দিলীপ ভিনসেন্ট গমেজ

ভুল সংশোধন

সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর ২০২২ খ্রিস্টাব্দের ২৭ সংখ্যায় শেষ পৃষ্ঠায় বিজ্ঞাপন নং - ২১১'এর ৫ নম্বর লাইনে ৩ জুলাই এর স্থলে ৩ জুন হবে। অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য আমরা আন্তরিক ভাবে দুঃখিত। -সম্পাদক

বন্ধু দিবসের ইতিকথা

জে আর এ্যাগ্নেস

বন্ধু আমার হৃদয়গ্রাহী থেকো না তুমি দূরে,
তোমার জন্য মনটা আমার যখন তখন পোড়ে।
বন্ধু তুমি ভালোবাসা তুমিই সুখের নীড়,
তোমার জন্য মন-দুয়ারে জমে প্রেমের ভিড়।

মনের সাথে মনের মিল আত্মার সাথে আত্মার শক্তিশালী বন্ধনের নামই হল বন্ধুত্ব। বন্ধুত্ব এমন একটা সম্পর্ক যেখানে মানুষই এর প্রকৃত স্বাদ, সৌন্দর্য বা তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারে। তাই মানব জীবনে বন্ধুত্ব অপরিহার্য। প্রতিটি মানুষের সুষ্ঠু সুন্দর ভাবে বেঁচে থাকার জন্য পারস্পরিক সম্পর্ক একান্ত কাম্য। আর এজন্যই মানুষ একে অপরের সাথে সু-সম্পর্ক গড়ে তোলে, বন্ধুত্ব করে। হাজার মানুষের ভিড়ে একজনকে আপন রূপে খুঁজে পায়। নির্দিধায় ব্যক্ত করে গোপন মনের অভিলাশ। সহভাগিতা করে মনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, দুঃখ-বেদনা, ইচ্ছা আনন্দ অনুভূতি। হৃদয়ের সবটুকু দরজা খুলে দেয় প্রিয় বন্ধুটির জন্য। নিবির বন্ধুত্বে থাকে পরস্পরের প্রতি স্নেহ, ভালোবাসা, সততা, আস্থা, বিশ্বাস, নির্ভরতা, পারস্পরিক বুঝাপড়া, সহানুভূতি, সমবেদনা, সহমর্মিতা, সহনশীলতা। পবিত্র বাইবেলে হিতোপদেশ ২৭:৯ বন্ধুত্বের সম্পর্কে বলে, "A sweet friendship refreshes the soul" ওয়ার্ল্ড হ্যাপিনেস ডেটাবেজ গবেষণায় দেখা গেছে যে, বন্ধুত্বের কারণে মানুষ অধিক সুখী হয়।

বন্ধুত্বের খাতিরে মানুষ সব ভেদাভেদ ভুলে যায়। ভুলে যায় ধনী-গরীবের মাপকাঠি। ভুলে যায় বয়সের তারতম্য। এখানে মনের সাথে মনের গভীর মিলন ঘটে। আবার আত্মার শক্তিশালী বন্ধন অটুট থাকে। একজন সত্যিকারের বন্ধু, বন্ধুকে সামনের দিকে নিয়ে যায়। সে বন্ধুর দূর্বলতা জানা সত্বেও বন্ধুর শক্তিশালী দিকটিই তুলে ধরে। বন্ধু বিপদগ্রস্ত হলে সর্বদা তার পাশে থাকে। নিজের ক্ষতি জেনেও সে বন্ধুকে সাহায্য করতে দ্বিধাবোধ করে না। একজন সত্যিকারের বন্ধু কখনো বন্ধুর বিচার করে না। বন্ধুর ভুল কৃতকর্মের জন্য তাকে নিয়ে উপহাস করে না বরং বন্ধুর দুর্বলতা ঢাকার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে। তার প্রিয় বন্ধুটি তাকে এক মাইল তার সাথে হাঁটতে বললে সে দশ মাইল হাঁটতেও কার্পণ্য বোধ করে না।

ইমারসন বলেন, "প্রকৃতির সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হচ্ছে বন্ধুত্ব।" অন্ধকারে একজন বন্ধুর সাথে হাঁটা আলোতে একা হাঁটার চেয়েও উত্তম। বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর লেখনীতে বন্ধু সম্বন্ধে অসামান্য একটি উক্তি রেখে গেছেন। তিনি বলেন, "গোলাপ যেমন একটি বিশেষ জাতের ফুল বন্ধু তেমনি একটি বিশেষ জাতের মানুষ।" এরিস্টটল বলেন, "প্রত্যেক নতুন জিনিসকেই উৎকৃষ্ট মনে হয়। কিন্তু বন্ধুত্ব যতই পুরাতন হয়, ততই উৎকৃষ্ট ও দৃঢ় হয়।" আমার কাছে বন্ধু মানে এমনই একটা অনুভূতি যা বিশাল শান্ত সমুদ্র জলে আপন সুখে সাঁতার কাঁটার মতোই বন্ধুত্ব।

বন্ধুত্ব একটি মহামূল্যবান উপহার। বন্ধুত্ব একজন মানুষকে আরেকজনের সঙ্গে মনের বন্ধনে আবদ্ধ করে। একে অপরে সুখ দুঃখ ভাগ করে নেয়। একই মনোভাবাপন্ন মানুষ অনায়াসে সফলভাবে বন্ধুত্ব গড়ে তুলতে পারে। সাধারণত সমবয়সী চিন্তাধারা এবং একই মেজাজের মধ্যে দ্রুত বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। সত্যি কথা বলতে, একে অপরকে বলে কয়ে কেউ কখনো কারো বন্ধু হতে পারে না। পথ চলতে চলতে কখন যেন একে অপরের বন্ধু হয়ে যায়। আর এটাই প্রকৃত বন্ধুর বৈশিষ্ট্য। বন্ধুত্বের কখনো বয়স বাড়ে না। তাই বন্ধুত্ব চির নবীন।

বন্ধু দিবস কেন পালন করা হয় বা এর উৎপত্তি কিভাবে? এমন প্রশ্নের উত্তর সঠিক ভাবে বলা কঠিন। তারপরও ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, তৎকালীন রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা অর্থাৎ প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের ভয়াবহতা, বিশৃঙ্খলা ও হিংস্রতা মানুষের মধ্যে অনেকটাই বন্ধুত্বের অভাব তৈরি করেছিল বলে অনেকের অভিমত। ফলে মানুষের মনে রাষ্ট্রীয়ভাবে বন্ধু দিবস পালন করার ধারণা এসেছিল বলে অনেকে মনে করেন।

এক সূত্র অনুযায়ী জানা যায় যে, ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের আগস্টের প্রথম রবিবার বন্ধুরা নিজেদের মধ্যে কার্ড, ফুল, উপহার বিনিময় করতো। তারপর জয়েস হলের প্রতিষ্ঠাতা হলমার্ক কার্ড বন্ধু দিবস পালনের রীতিকে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়েছিল।

তাছাড়া আরো জানা যায়, ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকার সরকার এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিল। দিনটি ছিল আগস্টের প্রথম শনিবার। তার প্রতিবাদে পরদিন ওই ব্যক্তির এক বন্ধু আত্মহত্যা করেন। এরপর থেকে জীবনের নানা ক্ষেত্রে বন্ধুদের অবদানের প্রতি সম্মান জানাতে আমেরিকার কংগ্রেসে ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে আগস্টের প্রথম রবিবারকে বন্ধু দিবস হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সেই থেকে বন্ধু দিবসের তাৎপর্য মানুষের মধ্যে খুব জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং আন্তজার্তিক বন্ধুত্ব দিবস এর রূপ লাভ করে।

১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দের ২০ জুলাই, ওয়ার্ল্ড ফ্রেন্ডসিপ ক্রুসেড (World Friendship Crusade) এর প্রতিষ্ঠাতা Dr. Ramon Artemio Bracho বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ে এক নৈশভোজের প্রস্তাব উপস্থাপন করেন। সেই রাতেই এই প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠা পায় এবং ৩০ জুলাই 'বিশ্ব বন্ধু দিবস' পালনের জন্য জাতিসংঘে প্রস্তাব পাঠায়। প্রায় ৫৩ বছর পর ২০১১ খ্রিস্টাব্দের ২৭ জুলাই জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ৩০ জুলাইকে বিশ্ব বন্ধু দিবস হিসেবে নির্ধারণ করা হয়। এভাবেই বন্ধু দিবস পালনের রীতি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ে।

একজন ভালো বন্ধু জীবনে আনে সুখ। তাই আমি মনে করি মানব জীবনে বন্ধুত্বের মাহাত্ম্য অত্যধিক। বন্ধু বিনা জীবন অপূর্ণ। সেজন্য প্রতিটি শিশু-কিশোর বা তদূর্ধ্ব বয়সের সকলকেই একটা বিষয় মনে রাখতে হবে যে 'বন্ধু নির্বাচনে সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক।' তাই সবশেষে একটা কথাই বলতে চাই "সৎ সঙ্গে হোক স্বর্গবাস' অসৎ সঙ্গে না হোক নরক বাস।"

"বন্ধুত্বে আছে প্রেম আছে অনাবিল সুখ"

সহায়ক গ্রন্থ : বাংলা উইপিডিয়া॥

বন্ধু

দিপালী কস্তা

একটা বন্ধু বড়ো দরকার-
যে কোন বয়সের জন্যই
একটা বন্ধু দরকার।
বন্ধুর জন্য কোন বয়স লাগে না।
বয়স চল্লিশ হয়েছে বলে বন্ধু লাগবেনা
এমন কোন কথা নেই-
ভালো সময়ে, দুঃসময়ে পাশে থাকার মতো একটা
নির্ভরশীল বন্ধু লাগে।
যাকে মন খুলে ভালো লাগার কথা বলা যাবে,
যাকে মনখুলে কষ্টের কথাগুলো বলা যাবে,
যাকে মন খুলে
সফলতা আর ব্যর্থতার কথা বলা যাবে।
যে কখনো দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে
আমার পাশে থাকবে না।
পাশে থাকবে আমাদের মুখে
একটা মিষ্টি হাসি ফোটাতে।
শত কর্মব্যস্ততায় বন্ধুর ফোন পেয়ে ছুটে যাব তার কাছে।
বন্ধুর ফোন পেয়ে ঘুম থেকে উঠেই
তার ডাকে সাড়া দিব।
এমন একটা নির্ভরযোগ্য বন্ধু বড়ো দরকার।

বন্ধু তোমার আমার

মিতালী মারিয়া কস্তা

"অন্ধকারে একজন বন্ধুর সঙ্গে হাঁটা আলোতে একা হাঁটার চেয়ে উত্তম।" আমরা বিশ্বাস করি সাত পা একসাথে হাঁটলেই বন্ধুত্ব হয়ে যায়। বন্ধুবিহীন জীবন মানেই নিঃসঙ্গ জীবন। বন্ধু এবং বন্ধুত্ব শব্দের অর্থ, ব্যাখ্যা বিভিন্ন জ্ঞানীজন বিভিন্নভাবে দিয়েছেন। আভিধানিক অর্থ এবং মণীষীদের দেওয়া সব অর্থ ও ব্যাখ্যা পর্যালোচনা করলে বন্ধুত্বের বৈশিষ্ট্যগুলি একইরকম অর্থ বহন করে। বন্ধুত্ব হলো মানুষের মধ্যে পারস্পরিক এমন একটি সম্পর্ক যা কিনা আত্মার শক্তিশালী বন্ধন তৈরী করে। স্থায়ী বন্ধুত্বের কিছু নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য হচ্ছে স্নেহ, সহানুভূতি, সহমর্মিতা, সততা, নিঃস্বার্থতা, পারস্পরিক বোঝাপড়া, সমবেদনা, একে অপরের সঙ্গ, আস্থা ইত্যাদি। সর্বোপরি বন্ধুত্ব মানে ভালোবাসা এবং বিশ্বাস। খুশিতে লাফিয়ে ওঠা, দুঃখে পাশে দাঁড়ানো, মন খুলে কথা বলা, বিনা কারণে হেসে গড়াগড়ি খাওয়া আর চূড়ান্ত পাগলামি করা শুধুমাত্র বন্ধুত্বেই সম্ভব। বন্ধুত্ব কোনো বয়স মেনে হয় না, ছোট-বড় সবাই বন্ধু হতে পারে। তবে বন্ধুত্বের মধ্যে যে জিনিসটা অবশ্যই থাকা চাই তা হল ভালোবাসা, আত্মার সঙ্গে আত্মার টান আর বিশ্বাস। বন্ধুত্বে বয়স কোন প্রতিবন্ধকতা তৈরী করে না।

আমাদের মা-বাবা আমাদের সব থেকে আপন বা কাছের মানুষ হলেও অনেক সময় আমরা অনেক বিষয় তাদের সাথে বলতে পারিনা। কিন্তু বন্ধুর সাথে অকপটে সবকিছু নির্দ্বিধায় বলা যায়। বন্ধু কখনো শিক্ষক, কখনও বা সকল দুষ্টুমির একমাত্র সঙ্গী। মনের বাঁধ ভাঙা উচ্ছ্বাস, আবেগ আর ছেলেমানুষী হৈ-হুল্লোড়ের অপর নামই তো বন্ধু। চলার পথে যে সম্পর্কে থাকেনা জাতিভেদ, যে সম্পর্ক থাকে সমস্ত বাঁধার ঊর্ধ্বে তা-ই বন্ধুত্ব। অর্থ দিয়ে বন্ধুত্ব কেনা যায় না, কিংবা গায়ের জোরেও বন্ধুত্ব হয় না। প্রিয় বন্ধু যত দূরেই থাকুক না কেন তাতে বন্ধুত্বে চিড় ধরে না। এমনকি অনেক দিনের অদেখাতেও বন্ধুত্ব হ্রাস পায় না। প্রকৃত বন্ধু কখনই বিপদে ফেলে পালিয়ে যায় না। বন্ধুর জন্য বন্ধুর প্রাণ বিসর্জন কোন নজিরবিহীন ঘটনা নয়। আধুনিককালে বন্ধুত্বের ব্যাপ্তি আরও বিস্তৃত। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের কল্যাণে বন্ধু শুধু আর পরিচিত অঙ্গনে আটকে নেই। এখন অনেকেরই অসংখ্য ভার্চুয়াল বন্ধু। এইসব ভার্চুয়াল বন্ধুদের মধ্যে অনেকেই অসৎ। এরা বন্ধুত্বের মুখোশ পড়ে অন্যদের ঠকায়। এরা অডিও-ভিডিও কলে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে, চমৎকার সব ক্ষুদ্রবার্তা পাঠায় এবং অনেককে মুগ্ধ করে। নানারকম কূহক তৈরি করে প্রলুব্ধ করে। আর অনেকেই ফেঁসে যায় এই ইন্দ্রজালে। ফেঁসে যাওয়া বন্ধুগুলোর কাছে তখন তাদের ভার্চুয়াল বন্ধুগুলো কোমল পানীয়ের মত আকর্ষণীয় মনে হয়। চিরপরিচিত গণ্ডীটাকে তখন সাধারণ পানি মনে হয়। আর যখনই সেই কোমল পানির স্বাদ নিতে চায় তখনই ধরা পড়ে তাদের মায়াজালে। অনেকে হারায় সম্ভ্রম, অনেকে হারায় টাকা-পয়সা আবার অনেকে হারায় সমাজ-সংসার, ধর্ম, নীতি ইত্যাদি। তাই বন্ধু নির্বাচনে প্রত্যেকেরই কৌশলী হওয়া উচিৎ। বন্ধু যেখানকার কিংবা যেই বয়সেরই হোক না কেন আলাপচারিতায় বুঝে নিতে হবে তার স্বচ্ছতা।

আজকাল অনেক ভার্চুয়াল বন্ধুত্বই প্রণয়ে পরিণত হচ্ছে। অনেকেই না বুঝে ফাঁদে পা দিচ্ছে। বিশেষ করে কিশোর-কিশোরীরা। বন্ধুত্বের বাঁধভাঙ্গা উচ্ছ্বাসে তারা জড়িয়ে পড়ছে নিষিদ্ধ কর্মকাণ্ডে। টের পেয়ে মা-বাবা বাঁধা দিতে এলে বা শাসন করলে হিতে বিপরীত হচ্ছে। তখন তারা মা-বাবাকেই শত্রু মনে করছে। তারা কিছুতেই বুঝতে চায় না যে মা-বাবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ বন্ধু পৃথিবীতে নেই। পেশাগত কারণে আমাকে অনেক কিশোর-কিশোরীদের সাথে কাজ করতে হয়। এ বয়সীদেরকে খুব সহজেই প্রলুব্ধ করা যায়। যদি ভাল কোন কিছু তাদের ইন্দ্রিয়ে স্থাপন করা যায় তাহলে তারা ভালোটাকেই আকড়ে ধরে। একইভাবে মন্দ কাজেও তারা সহজেই প্ররোচিত হয়। তাই আমাদের বাবা-মায়েদের উচিৎ খুব ছোটবেলা থেকে সন্তানদের বন্ধুদের সাথেও বন্ধুত্ব করা। ফেসবুক-টুইটারে নিজেদের বন্ধু তালিকায় ছেলে-মেয়েদেরকে রাখা। তাদের পোস্ট, কমেন্টগুলো দেখে প্রয়োজনে তাদেরকে পরামর্শ দেওয়া।

ঘটনা- ১

ইরা একটা ভাল কলেজে একাদশ শ্রেণীতে পড়ে। ফেসবুকে প্রথমে বন্ধুত্ব এবং পরে প্রেম। ফোনে কথা হয়। ক্ষুদ্রবার্তা আদান-প্রদান হয়। একজন আরেকজনের ছবি শুধু ফেসবুকে দেখে। দুজন দুজনকে বিয়ের কথা দেয়। কিন্তু কেউ কাউকে সামনাসামনি দেখেনি। একদিন ছেলেটি ইরাকে দেখা করার জন্য দাবী জানায়। ইরা খুব পর্দাশীল পরিবারের মেয়ে। একা কোথাও যাওয়ার অনুমতি নেই। তাই কলেজে এসে বন্ধুদের সহায়তায় কলেজ পালিয়ে দেখা করতে যায় তার ফেসবুকে পাওয়া সেই প্রেমিকের সাথে। নির্দিষ্ট সময়ে কলেজে ফিরে আসে। সেদিনের বাকী সময় সে পার করেছে কান্নাকাটি করে। কারণ কি? কারণ ফেসবুকে ছবিতে দেখা সে প্রেমিক বাস্তবে অনেক বয়স্ক।

ঘটনা- ২

নয়না একটা ভাল কলেজে একাদশ শ্রেণীতে পড়ে। ফেসবুকে প্রেম। পালিয়ে বিয়ে। বিয়ের পর ছেলের বাড়িতে গিয়ে চক্ষু চড়কগাছ! ছেলের পরিবার বস্তি লেভেলের বললেই চলে। অথচ বাড়িতে সে ছিল রাজকন্যা, মা-বাবার একমাত্র মেয়ে। সেই পরিবারে যাওয়ার দিন থেকেই তাকে হিজাব পরতে হয়, সংসারের সব কাজ করতে হয়। অথচ সে সম্ভ্রান্ত খ্রিস্টান পরিবারের মেয়ে। বাকীটা ইতিহাস।

উপড়ের ঘটনাগুলো আমাদের অনেক কিছু শিক্ষা দেয়। কোন মা-বাবা সন্তানের বিপথে যাওয়া সহ্য করতে পারে না। একইভাবে কোন সন্তানও মা-বাবার অশান্তি মেনে নিতে পারে না। তাই মা-বাবার উচিৎ সন্তানদের দিকে তাকিয়ে নিজেদের ইগো এবং আত্মমর্যাদায় বিভোর হয়ে বিচ্ছিন্ন না হওয়া। সন্তানদেরও উচিৎ মা-বাবার ত্যাগস্বীকারকে মূল্যায়ন করা। পরিবারে সবার সম্পর্ক হওয়া উচিৎ বন্ধুত্বপূর্ণ।

আমাদের খ্রিস্টীয় সমাজে দেখা দিচ্ছে মূল্যবোধের অবক্ষয়। এই ক্ষয়রোধে অগ্রজদের ভালোবাসার হাত বাড়াতে হবে অনুজদের প্রতি। আদর্শ পরিবার তৈরি করে আদর্শ সমাজ, আদর্শ সমাজ তৈরি করে আদর্শ দেশ তথা জাতি। আদর্শ পরিবারের আবহ থাকবে বন্ধুত্বপূর্ণ। বন্ধুত্বের পূর্ব শর্ত হল ভালবাসা। যিশুখ্রিস্ট হল ভালবাসার সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ উদাহারণ। ক্রুশে প্রাণত্যাগ করে তিনি শিখিয়েছেন কিভাবে ভালবাসতে হয়। পবিত্র বাইবেলে ১ *করিন্থীয়* ১৩ *অধ্যায়ে* শ্রেষ্ঠত্বের চাবি দিয়ে দেওয়া হয়েছে আর তা হচ্ছে ভালবাসা। প্রকৃত ভালবাসা কিংবা প্রকৃত বন্ধুত্বে যে গুণাবলী থাকা প্রয়োজন বলে মণীষীগণ মনে করেন তা সবই এই অধ্যায়ে চমৎকারভাবে বলা হয়েছে ..... "ভালবাসা ধৈর্য্য ধরে, ভালবাসা দয়া করে, ভালবাসা ঈর্ষা করে না, অহঙ্কার বা গর্ব করে না, ভালবাসা কোন অভদ্র আচরণ করে না, ভালবাসা স্বার্থ-সিদ্ধির চেষ্টা করে না, কখনও রেগে ওঠে না, অপরের অন্যায় আচরণ মনে রাখে না, ভালবাসা কোন মন্দ বিষয় নিয়ে আনন্দ করে না, কিন্তু সত্যে আনন্দ করে, ভালবাসা সব কিছুই সহ্য করে, সব কিছু বিশ্বাস করে, সব কিছুতেই প্রত্যাশা রাখে, সবই ধৈর্যের সঙ্গে গ্রহণ করে, ভালবাসার কোন শেষ নেই" আমরা যদি সত্যিই একজন আরেকজনকে ভালবাসি সেটা পরিবারে হোক কিংবা বন্ধুত্বের ক্ষেত্রে হোক, আমাদের মধ্যে যদি বাইবেলে বর্ণিত এই গুণাবলীগুলি না থাকে তাহলে সম্পর্ক হবে ঠুন্‌কো, ভঙ্গুর। একজন ভালো বন্ধু সবসময় বন্ধুর ভালো চায়। নিজের ভালো হোক সকলেই চায়, তবে তার জন্য বন্ধুর ক্ষতি হোক এমন ভাবা কিন্তু প্রকৃত বন্ধুর পরিচয় নয়। বন্ধুর কল্যাণ কামনাই প্রকৃত বন্ধুর পরিচায়ক। ভালো সম্পর্ক মানেই প্রকৃত বন্ধু নয়। প্রকৃত বন্ধু হতে হলে বাইবেলে বর্ণিত প্রতিটা গুণ থাকা বা চর্চা আবশ্যক। সর্বোপরি আমাদের মনে রাখতে হবে যে যিশুই আমাদের প্রকৃত বন্ধু। কারণ তিনি আমাদের এক মুহূর্তের জন্যও কখনো ছেড়ে যান না। আমরা তাকে কষ্ট দিলেও, তার প্রতি অবিশ্বস্ত হলেও তিনি সবসময় ভালবেসে আমাদের পাশে থাকেন। আমরা তার উপর নির্ভর করতে পারি। তিনি কখনও আমার অতি গোপন কোনো কিছু কারো কাছে প্রকাশ করবেন না। আমাদের প্রতি তার ভালবাসা নিঃস্বার্থ। আমরা ডাকি কিংবা না ডাকি তিনি সর্বদাই আমাদের পাশে থাকেন একজন সত্যিকারের বন্ধু হিসেবে। আমাদেরও উচিৎ নিঃস্বার্থভাবে তাকে ভালবাসা। বন্ধুত্ব আমার-আপনার প্রত্যেকের জীবনের অমূল্য সম্পদ। জয়তু বন্ধুত্ব!

ঐতিহ্যগত বিদ্যা সংরক্ষণ ও বিকাশে গারো নারীসমাজের ভূমিকা

জাসিন্তা আরেং

আধুনিকতার ছোঁয়ায় দেশের আদিবাসী নারীরা সকল ক্ষেত্রে এগিয়ে গিয়েছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আদিমতার জ্ঞান পরিত্যাগ করে নতুন প্রথা, নবীন জ্ঞান ও সংস্কৃতিকে আপন করে নিয়েছে। বর্তমানে কিছুটা আদিমতা আঁকড়ে ধরে রাখলেও তাতে নতুন মাত্রার সংযোজন ঘটেছে এতে কোন সন্দেহ নেই। এসব ক্ষেত্রে পিছিয়ে নেই ময়মনসিংহের পাদদেশে বসবাস করা পাহাড়ি গারো নারীরা। সমাজের ক্ষুদ্র ও সংকীর্ণ গন্ডি থেকে শুরু করে বৃহত্তর সামাজিক অঙ্গনেও গারো নারীদের পদচারণা নজর কাড়ে। গারো নারীরা সেই সাবেকি ঐতিহ্যের ধারক হিসেবে আজও মাথা উঁচু করে সমাজে পাল্লা দিয়ে চলছেন। গারো নারীরা আধুনিকতার ছোঁয়ায় খানিকটা গা ভাসালেও, ভাসায়নি তাদের ঐতিহ্যগত বিদ্যা এবং কৃষ্টি-সংস্কৃতির তালিম। সেকেলে বিদ্যাকে যথাযথ সংরক্ষণ করে চলেছেন ও আপন বৈশিষ্ট্যে তা প্রসার করে চলেছেন প্রতিনিয়ত। গারো নারীসমাজ আপন আঙিনায় ঐতিহ্যগত বিদ্যা সযতনে চর্চা ও সংরক্ষণ করছেনতো বটেই; এছাড়াও বাড়ির গন্ডি ছাড়িয়ে গারোদের ঐতিহ্যগত জ্ঞান বিকাশে অতুলনীয় ভূমিকা রাখছে নির্দ্বিধায়।

মাতৃতান্ত্রিক রীতি ও নারী ক্ষমতায়ন: আদিকাল থেকেই গারো আদিবাসী নারীরা স্বাতন্ত্র্য ভূমিকা পালন করে আসছেন পরিবার কাঠামোতে। পরিবারে নারী প্রধান এবং সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদিতে তারা প্রাধান্য পেয়ে এসেছে। এটাই যেন গারো সমাজের রীতি বা প্রথা। তবে সভ্যতার ক্রমবিবর্তনের মাঝেও বিস্ময়ের সাথে আজও মাতৃতান্ত্রিকতার প্রথা সযত্নে আগলে রেখেছেন আদিবাসী এই নারীরা। সংরক্ষণ ও চর্চার মাধ্যমে সেসব ঐতিহ্যকে সজীব রেখেছেন এবং পরবর্তী প্রজন্মের কাছে আপন সংস্কৃতির বীজ বপন করে যাচ্ছেন। যেন তারা তাদের এই ঐতিহ্যকে আগামীতে সম্ভাবনাময় করে তুলতে পারে। আদি অর্থনীতি অনুসারে, মাতৃতান্ত্রিক পরিবারই ছিলো সমাজের আদি ও অকৃত্রিম প্রতিষ্ঠান। বিজ্ঞান ও বিশ্বায়নের যুগে সেই মাতৃতান্ত্রিক প্রথার চর্চা, সংরক্ষণ এবং বিস্তার পিতৃতান্ত্রিক প্রথার দাপটে বিলুপ্তপ্রায় হলেও আজও গারো নারীরা তাদের আদি ঐতিহ্যের বিদ্যা সংরক্ষণ ও পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যদিয়ে বিস্তার করে চলেছেন সফলভাবে। বর্তমানে মাতৃতান্ত্রিক পরিবার কাঠামোর ছিটেফোঁটা বিশ্বজুড়ে বা অন্যান্য আদিবাসীদের মধ্যে অবশেষ না থাকলেও গারো নারীরা পরিবারে তাদের দৃঢ় অবস্থান ধরে রেখেছেন এবং মাতৃতান্ত্রিক কর্তৃত্ব বহাল রেখেছেন। যে কলিযুগে নারীরা তাদের অস্তিত্ব, অধিকার ও স্বাধীনতা এবং ক্ষমতায়ন নিয়ে লড়াইয়ে ব্যস্ত, সেখানেও গারো নারীরা তাদের আধিপত্য ও সম্পত্তির একক অধিকার ভোগ করছেন। বাঙালি সমাজে গারো নারীরা সম্মান, মর্যাদা এবং ক্ষমতার অধিকারী হোক বা না হোক; ব্যক্তিগত পরিবারে গারো নারীরাই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। সভ্যতা বদলে গেলেও গারো আদিবাসীদের মধ্যে নারীরা এই ঐতিহ্যগত জ্ঞানকে সংরক্ষণ করছেন এবং একক পরিবারের ভিত্তি প্রসারে অবদান রেখে চলেছেন।

ভাষা শিক্ষা ও শিক্ষাদান: স্বাভাবিকভাবেই, আদিকাল থেকে যে কোন জাতি নিজের ভাষাটা মায়ের কাছ থেকে আয়ত্ত্ব করে থাকে। গারো জাতিও এর ব্যতিক্রম নয়। গারো নারীরা শিক্ষিত বা অশিক্ষিত যা হোক না কেন জন্মের পর থেকেই তাদের সন্তানদের গারো ভাষা শিখিয়ে থাকেন। এক্ষেত্রে বাবার ভূমিকাও অস্বীকার করা যায় না কিন্তু মায়ের বা নারীর ভূমিকা অনেকাংশেই বেশি বলা চলে। গারো নারীরা ভাষা শেখানোর পাশাপাশি সন্তানদের নৈতিক শিক্ষাদানের ওপরও বিশেষ গুরুত্বারোপ করে থাকেন। সন্তানেরাও মায়ের শেখানো বুলি অনায়াসেই রপ্ত করে তা চর্চা করে থাকে এবং নৈতিক শিক্ষা গ্রহণ করে সেইমত আচরণের চেষ্টা করে থাকে। গ্রামে বা প্রত্যন্ত অঞ্চলে মাতৃভাষাটা বাংলা ভাষার চেয়ে অধিক গুরুত্ব এবং ব্যবহার হলেও শহরের বিষয়টি কিছুটা আলাদা। শহরের বৃহত্তর সমাজের সাথে চলতে হয় বিধায় এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বাংলা বা ইংরেজী প্রাধান্য পাওয়ায় শহুরে গারো নারীরা তাদের সন্তানদের মাতৃভাষার পাশাপাশি বাংলা ও ইংরেজীর পাঠ পড়িয়ে থাকেন।

ঐতিহ্যগত জিনিসপত্র সংরক্ষণ: গারোদের ঐতিহ্যগত জিনিসপত্র যা তাদের আদি-পুরুষেরা ব্যবহার করতেন বিভিন্ন উদ্দেশে যেমন রাং-ক্রাম কারো মৃত্যু সংবাদ আত্মীয়-স্বজনদের কাছে পৌঁছে দিতে হলে তা বাজানো হতো। তবে যুগ বদলের সাথে-সাথে তা এখন খ্রিস্টীয় ধ্বনি হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এছাড়াও, দিবাং, বিভিন্ন ধরনের দামা, আদিল, আদুরু, নাগড়া, ক্রাম, দিমচ্রাং, পাংশি বা বাংশি ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র গান-বাজনা ও আনন্দ উচ্ছাস প্রকাশের জন্য ব্যবহার করা হতো। বর্তমানে এসব বাদ্যযন্ত্র খ্রিস্টীয় সঙ্গীত ও কীর্তনে ব্যবহৃত হয়। প্রত্যন্ত অঞ্চলে বা গ্রামে-গঞ্জে অনেকের বাড়িতেই এসব বাদ্যযন্ত্র দেখতে পাওয়া যায়। এছাড়াও, গারোদের পূর্বপুরুষদের শিকারকৃত হরিণ বা বিভিন্ন পশুর মাথা ও শিং, হাতির দাঁত ইত্যাদি সংরক্ষণে নারীদের ভূমিকা অন্যতম। যদিও তা এখন বিলুপ্তির পথে। গারো নারীসমাজ এসব জিনিসপত্র বা বাদ্যযন্ত্র অতি যত্ন সহকারে নিজেদের বাড়িতে সংরক্ষণ করে রেখেছেন যার মাধ্যমে তাদের অগোচরেই সন্তানদের ঐতিহ্যগত জ্ঞানপ্রাপ্তি সুষ্ঠুভাবে তা সংরক্ষণ সম্ভব হবে। (চলবে)

ফ্ল্যাট বিক্রয় হবে

১১০০ স্কয়ার ফিট (Square feet) ফ্ল্যাট বিক্রয় হইবে ২য় তলা পশ্চিম রাজাবাজার মধ্যে।

জেনারেটর, লিফট ও পার্কিং এর সুব্যাবস্থা আছে। ৩ বেড রুম, ২ বাথ রুম, ড্রয়িং, ডাইনিং, কিচেন এবং ২টি ব্যালকনি আছে।

ফোন নম্বর : ০১৭১৩০১৮১৬১,
০১৮৭৯৬৬৬০৭৬

বিজ্ঞ/২২২/২২

পোপ ফ্রান্সিসের 'অনুশোচনামূলক তীর্থযাত্রা': আবেগ আর অশ্রুসজল আনন্দ

সঞ্জীব দ্রং

১. পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিসের বহু প্রতীক্ষিত পেনিটেনশিয়াল পিলগ্রিমজ্ বা 'অনুশোচনামূলক তীর্থযাত্রা'র খবর ব্যাপকভাবে ছবিসহ আন্তর্জাতিকপর্যায়ে প্রচারিত হচ্ছে। আজ ২৫ জুলাই সোমবার এই লেখা যখন লিখছি, তখন দ্য গার্ডিয়ান নিউজ ওয়েভসাইটে দেখছি পোপ মহোদয় আদিবাসী সজ্জায় মাথায় পাখির পালক আর শুভ্র বসনে সামনের দিকে চেয়ে আছেন। রয়টার্স, ভাতিকান নিউজ সকলে ফলো করছে এই সফর। গার্ডিয়ান ক্যাপশন করেছে, 'আই এ্যাম ডিপলী সরি।' আমরা সকলে জানি, ১৮০০ থেকে ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কানাডার মিশনারী আবাসিক স্কুলগুলোতে ফার্স্ট নেশনস্ বা আদিবাসী শিশুদের তাদের পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন করা হতো। সেই সময়ের সরকারের নীতির ফলে এই যে ক্ষতি হয়ে গেছে, তাঁকে পোপ ফ্রান্সিস বলছেন মারাত্মক ভুল। শুধু কাথলিক চার্চ নয়, এ্যাংলিকান ও প্রটেস্টান্ট চার্চসমূহ এইসব স্কুল পরিচালনা করতো। সেই সময়ে যারা শিশু ছিলেন, যারা এখনো বেঁচে আছেন তাদের অন্তত ২,০০০ জন এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। যারা ভিডিও দেখেছেন, নিউজে সাক্ষাৎকার দেখেছেন, নিশ্চয় খেয়াল করেছেন, পোপ ফ্রান্সিসের এই সফরে ও তাঁর কথায় অনেকে আবেগে আপ্লুত হয়েছেন। চোখ ফেটে জল তাদের, হৃদয়ে অস্ফুট কান্না। একজন বলেছেন, জীবনে কোনদিন কল্পনাও করেননি পোপ মহোদয় এখানে আলবার্টায় আসবেন এবং তাদের দুঃখের ভার লাঘব করবেন। আদিবাসী প্রবীন উইলটন লিটলচাইল্ড পোপ মহোদয়কে যখন আদিবাসী পালক দিয়ে সম্মানিত করেন, তখন সমবেত জনতা উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন। আমি উইলটনকে দেখেছি অনেকবার জেনেভা ও নিউ ইয়র্কে। বয়স মনে করি আশি পেরিয়ে নব্বইয়ের দিকে ধাবমান তার। এখনো কথা বলে চলেছেন আদিবাসী মানুষের জন্য। জাতিসংঘে বিশেষ দূত ছিলেন।

২.পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস তাঁর বহু প্রতীক্ষিত 'অনুশোচনামূলক তীর্থযাত্রা' বা পেনিটেনশিয়াল পিলগ্রিমজ্ শুরু করেছেন ২৪ জুলাই। রোববার সকালে তিনি কানাডার আলবার্টা প্রদেশের এডমন্টনে অবতরণ করেন। তাঁর এই সফরকে বহু প্রতীক্ষিত বলছে এই কারণে যে, গত এপ্রিলে পোপ মহোদয় কানাডার ফার্স্ট নেশনস্ বা আদিবাসীদের সাথে রোমে কথা বলেছেন। এই সাক্ষাতের সময়ই তিনি বলেছিলেন কানাডা সফর করবেন। ২০১৯ খ্রিস্টাব্দের পর এটিই পোপ মহোদয়ের দীর্ঘ দশ ঘন্টার অধিক প্লেন যাত্রা। হাঁটুতে ব্যথার কারণে তাঁকে হুইল চেয়ারে চলতে হয় ফ্লাইট থেকে নেমে। এত কষ্ট সহ্য করে তিনি কানাডা সফর করছেন আদিবাসী মানুষদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করার জন্য। এই তীর্থযাত্রার মধ্যদিয়ে আশা প্রকাশ করা হচ্ছে, ১৮০০ থেকে ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কানাডায় কাথলিক চার্চ পরিচালিত আবাসিক স্কুলগুলোতে আদিবাসী শিশুদের প্রতি যে 'ভুল আচরণ' করা হয়েছে, তার কিছুটা হলেও নিরাময় হবে।

৩. পোপ ফ্রান্সিসের এই সফর শুরু হয় ২৪ জুলাই রোববার। এইদিন সকালে তিনি এডমন্টনে অবতরণ করেন। ডাউনটাউনে রোববারের খ্রিস্টযাগ শুরু হয় আদিবাসীদের ঐতিহ্য অনুসরণ করে। শোভাযাত্রা হয় বাদ্য-বাজনা বাজিয়ে, সংগীত সহকারে। আর খ্রিস্টযাগের কিছু অংশ সম্পন্ন হয় আদিবাসী ক্রী ভাষায়। এডমন্টন যিশু হৃদয় গির্জার পাল-পুরোহিত অবলেট ফাদার সুসাই জেসু তার স্বাগত ভাষণে সকলকে মনে করিয়ে দেন, এখানকার মানুষের মূল্যবোধের কেন্দ্রস্থল হলো স্বাগতম অভ্যর্থনা ও অন্তর্ভুক্তি আলিঙ্গন।

ধারণা করা হচ্ছে পোপ মহোদয় এইসব শিশুদের সমাধিস্থলে যাবেন এবং প্রার্থনা করবেন। তাঁর এই সফর মানবসমাজকে এমন এক বার্তা দিচ্ছে যেখানে ভুল স্বীকার করা বা ক্ষমা করা সাধারণ মানুষের কাজ নয়। ক্ষমা করা বা ক্ষমা প্রার্থনার জন্য সততা, ভালোবাসা ও শক্তির প্রয়োজন হয়। দুর্বল ও অসৎ মানুষ ক্ষমার মাহাত্ম্য বুঝতে অক্ষম।

'লাউদাতো সি'তে পোপ মহোদয় ধরিত্রী, কমন হোম, জীববৈচিত্র্য, প্রকৃতি, জলবায়ু ও যে মানব সমাজের কথা বলেছেন, সেখানে ধরিত্রী সম্পর্কে আদিবাসী মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি বা ওয়ার্ল্ডভিউ ফুটে ওঠে। যে সেন্স অব ইমোশন আমি দেখি তাঁর কাজে ও কথায়, সেটি সকল মানুষকে স্পর্শ করলে পৃথিবীটা অন্যরকম সুন্দর হয়ে উঠতো। রিপেনটেন্স এন্ড রিকনসিলেশন বা অনুতাপ ও পুনর্মিলনের যে আকাঙ্খা ও বারতা নিয়ে পোপ ফ্রান্সিসের এই তীর্থযাত্রা, তা কানাডার ফার্স্ট নেশন জাতির ইতিহাসে আবার ফিরে আসবে কিনা, গভীর সন্দেহ। কিন্তু যে ছোঁয়া, যে প্রলেপ ও স্পর্শ প্রসারিত করে গেলেন তিনি, তার কোনদিন ক্ষয় নেই।

৪.বিশ্বব্যাপী এই আদিবাসী মানুষেরা অসহায় ও বঞ্চিত। জাতিসংঘ এই কারণে ২০০০ খ্রিস্টাব্দে একটি আদিবাসী বিষয়ক স্থায়ী ফোরাম গঠন করে। তারপরে ২০০৬ খ্রিস্টাব্দে হিউম্যান কাউন্সিলে এক্সপার্ট মেকানিজম হয়। ২০০৭ খ্রিস্টাব্দে জাতিসংঘ আদিবাসী অধিকার ঘোষণাপত্র গৃহিত হয় সাধারণ পরিষদে। তারপর বিশ্ব সম্মেলন হয় জাতিসংঘে আদিবাসীদের ২০১৪ খ্রিস্টাব্দে এবং আউটকাম ডকুমেন্ট বের হয়। 'লিভিং নো ওয়ান বিহাইন্ড' মূলসুর নিয়ে যে এসডিজি ২০৩০ এজেন্ডা চলছে, তার অনেক অংশ জুড়ে আছে আদিবাসী মানুষের দারিদ্র ও বঞ্চনার কথা। পোপ ফ্রান্সিস ৮৫ বছর বয়সে এই যে দীর্ঘ সফর করেছেন, হুইল চেয়ার নিতে হয়েছে তাঁকে, এই যে তিনি অনুশোচনার তীর্থযাত্রা করেছেন, বিশ্বের নেতারা, ক্ষমতাধর মানুষেরা, এমনকি সাধারণ মানুষেরা যদি তাঁর মেসেজ সামান্য হলেও হৃদয়ে অনুভব করতে পাবেন, তাহলেই সমাজ ও পৃথিবীটা হয়তো কিছুটা হলেও বদলে যাবে। আসুন সকল মানুষের প্রতি মমতা ও ভালোবাসার বারতা ছড়িয়ে দেই।

আমি 'প্রতিবেশী'তে আমার লেখার পাঠকদের অনুরোধ করবো আপনারা অনলাইনে পোপ মহোদয়ের এই কানাডা তীর্থযাত্রার ভিডিও দেখবেন। কী আবেগ, কান্না, অশ্রুভেজা আনন্দ এই আদিবাসী প্রবীণ মানুষদের মধ্যে। অনুতাপ, অনুশোচনা মানুষের অন্তরকে ভিজিয়ে দেয়। নম্রতা, বিনয়, ক্ষমা, সৌজন্য, মানুষের প্রতি ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার মধ্যেই যে প্রকৃত জীবনের আনন্দ মিশে থাকে, এইসব ভিডিও ও মানুষের কান্না দেখে সকলের এমন অনুভূতি জেগে উঠবে॥

ভালো নেই সিলেটের আদিবাসীরা

সিলভানুস লামিন

এক : বাংলাদেশের ৮টি বিভাগের একটি বিভাগ সিলেট। আয়তন ৩,৪৯০.৪০ বর্গ কি:মি:। উত্তরে ভারতের খাসিয়া-জৈন্তিয়া পাহাড়, দক্ষিণে মৌলভীবাজার জেলা, পূর্বে ভারতের কাছাড় ও করিমগঞ্জ জেলা, পশ্চিমে সুনামগঞ্জ ও হবিগঞ্জ জেলা। সিলেট বিভাগে খাসি, গারো, পাত্র, ওরাঁও, মুন্ডা, খারিয়াসহ আরও অনেক আদিবাসী (সরকারি নথিতে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী) বাস করে। খাসিরা সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ ও সুনামগঞ্জের পাহাড়ি এলাকায় বাস করেন। খাসিদের বেশকিছু পুঞ্জিতে (গ্রাম) গারোদের বসবাস রয়েছে। পান চাষ করেই এই জনগোষ্ঠী জীবিকা নির্বাহ করে। খাসিরা সরকারি খাস, বনবিভাগ ও চা বাগানের জমি লিজ নিয়ে পান চাষ করেন। তবে সিলেটের জাফলং ও জৈন্তিয়াপুর এলাকায় খাসিদের নিজস্ব জমি রয়েছে। বাংলাদেশে আনুমানিক ১০০টি খাসিয়া গ্রাম রয়েছে। অন্যদিকে সিলেট বিভাগের প্রায় প্রতিটি চা বাগানেই রয়েছে খারিয়া, ওরাঁও, মুন্ডা এবং ক্ষেত্রবিশেষে গারো আদিবাসীদের বাস। মূলত এরা চা শ্রমিক বা চা জনগোষ্ঠী হিসেবেই বেশি পরিচিত। চা বাগানে কাজ করেই তারা জীবিকা নির্বাহ করেন। প্রায় চা-বাগানগুলোতেই নাগরিক সুযোগ-সুবিধা কম, কোথাও কোথাও বলতে গেলে নেই-ই। চা বাগানে এরা মানবেতর জীবনযাপন করছেন। সরকারি সুযোগ-সুবিধা তো দূরের কথা, এমনকি কোনও বেসরকারি সংস্থাও চা-বাগানগুলোতে কাজ করার অনুমতি পায় না। চা বাগান থেকে চা শ্রমিকরা মজুরিসহ রেশন পান, ন্যুনতম ব্যয়ে স্বাস্থ্যসেবা পেয়ে থাকেন চা শ্রমিকরা তবে পরিমাণ খুবই সামান্য। অপরদিকে সিলেট সদর থেকে পূর্ব উত্তর, পশ্চিমে পাত্র সম্প্রদায়ের বাসবাস। বাংলাদেশের সিলেটেই একমাত্র পাত্র সম্প্রদায় এর বসবাস রয়েছে। পাত্র সম্প্রদায় সিলেটের ৩টি উপজেলার ৬টি ইউনিয়নের ৩২টি গ্রামে বসবাস করেন। পাত্রদের সাথে কথা বলে জানা যায়, তাঁরা ১৩ শতক থেকেই সিলেট উপশহরে বাস করে আসছেন। স্বাধীনতাপূর্ব সময় পর্যন্ত তাদের প্রচুর জমি-জমা ছিলো। তবে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বিমানবন্দর সম্প্রসারণের নামে সরকার তাদের জমি অধিগ্রহণ করে কোনও ক্ষতিপূরণ ছাড়াই। এছাড়া পরবর্তীতে সিলেট জেলার সম্প্রসারণ ও নগরায়নের কারণে আস্তে আস্তে তাদের জমি-জমার দিকে লোলুপ দৃষ্টি পড়ে স্থানীয় ভূমিখেকো ও প্রভাবশালী মানুষের। অন্যদিকে নানান কুসংস্কারের কারণে পাত্ররা শিক্ষালাভে আগ্রহী হয়ে ওঠেনা। ফলশ্রুতিতে তাদের অশিক্ষার সুযোগ নিয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তিরা প্রতারণা, জালিয়াতি, শোষণ, হয়রানি, ভয়ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে তাদের জমি দখল করে নেয়।

দুই : সার্বিকভাবেই খুব ভালো নেই সিলেটের এই আদিবাসীরা। নানান বঞ্চনা, অস্বীকৃতি ও শোষণ নিপীড়নের শিকার তারা। নানান বঞ্চনার কারণে এই আদিবাসীদের জীবন ও জীবিকা বিপন্ন। জীবিকা বিপন্ন বলে এই আদিবাসীরা দিনকে দিন আরও প্রান্তিক হচ্ছেন। সিলেটের বেশির ভাগ আদিবাসীদেরই নিজস্ব কোন ভূমি নেই। খাসিয়ারা সরকারি খাস জমি, বনবিভাগের জমি কিংবা চা বাগানের জমি লিজ নিয়ে বাসবাস করেন। খাসজমিতে দীর্ঘ বছর বসবাসের পরও সেই জমি তাদের নামে রেকর্ড হয় না! বরং দিনকে দিন তারা আরও ভূমিহীন হয়ে পড়েছেন। যেসব জমি তাদের মালিকানাধীন বা দখলস্বত্বে রয়েছে সেগুলো জরবদস্তি করে কিংবা নানান উন্নয়ন অবকাঠামো, উন্নয়ন প্রকল্প নির্মাণের অজুহাতে তাদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছে। পত্রিকান্তরে প্রায়ই দেখা যায়, সিলেটে আদিবাসীদের ভূমি হারানোর সংবাদ, ভূমিকে কেন্দ্র করে তাদের উৎপীড়নের সংবাদ। অন্যদিকে 'সামাজিক বনায়ন' নামে খাসিদের জমি দখল করা হয়েছে অনেকবার। এ সম্প্রদায়ের প্রথাগত অধিকারকে কোনভাবে স্বীকার ও শ্রদ্ধা না করেই তাদের জুম-জমি, ভিটেমাটিতে 'প্রকল্প' বাস্তবায়ন হচ্ছে বা হয়েছে। যে জমি-জুমে খাসিরা বিভিন্ন প্রজাতির দেশি গাছপালা রোপণ ও লালন পালন করে আসছেন সে জমি-জুমগুলোতে নতুন করে 'বনায়ন' করার দরকারই নেই। খাসিয়াদের পানজুমে নতুন করে গাছ লাগানোর কোন প্রয়োজন না হলেও যেসব গাছ রয়েছে সেগুলো কেটে, বিক্রি করে মুনাফা অর্জনের জন্য স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিরা নানান তৎপরতা চালাচ্ছেন। বনায়ন করার নামে সেখানে 'আগ্রাসী' বিদেশি প্রজাতির গাছ রোপণ করে শুধু খাসিদের বিতাড়িত করছে না বরং স্থানীয় প্রাণবৈচিত্র্য নির্মূলেও ভূমিকা রাখছে। ভূমির জন্য এ পর্যন্ত অনেক আদিবাসী মানুষ প্রাণ দিয়েছেন। নানা নির্যাতন ও শোষণের শিকার হয়েও আদিবাসীরা কদাচিৎ প্রশাসনের সহযোগিতা পায়। জমি সংক্রান্ত কোনও বিরোধ হলে বিচার চাইলে তারা কখনও ন্যায্য বিচার পান না। আদিবাসীদের আর্থ-সামাজিকসহ অন্যান্য অবস্থার উন্নয়নে স্থানীয় প্রশাসনের অবহেলা কোনও অংশে কম নয়। প্রভাবশালীরা আদিবাসীদের জায়গা-জমি দখল, সম্পদ নষ্ট করলেও বিচার চাইলে তাঁরা কখনও ন্যায্য বিচার পান না। বেশির ভাগ খাসি পুঞ্জিগুলোর জুমের পান নষ্ট, গাছ কাটা, জুমে জমিতে গরু-মহিষ, হাতি চড়ানো হয় কিন্তু খাসিরা তার প্রতিবাদ করলে উল্টো তাদের হয়রানি করা হয়। এদিকে সিলেট শহরে বসবাসকারী পাত্ররা একসময় অনেক জমির মালিক ছিলেন কিন্তু নানা কৌশলে তাদের জমিগুলো আজ অন্যদের মালিকানায় চলে গেছে আর পাত্ররা ভূমিহীন হয়ে দিনমজুরি করে দিনাতিপাত করছেন। এখনও যাদের জমি রয়েছে সেগুলো হারানোর আতংকের মধ্যে আছেন অনেক পাত্র সম্প্রদায়। মূলত নিরক্ষরতা, অশিক্ষার কারণে সিলেটের আদিবাসীরা মূলধারার মানুষের থেকে পিছিয়ে রয়েছে। অন্যদিকে গারো বা ওরাঁও, মুন্ডারা বাস করেন চা বাগানে। সেখানে তারা বেশির ভাগ 'শ্রমিক' হিসেবে পরিচিত। বঞ্চনা, অবহেলা আর অসমতার ফলে তারা আরও প্রান্তিকতায় উপনীত হয়েছেন। অধিকারহীনতা, সাংবিধানিক স্বীকৃতির অভাবের কারণে যতদিন যাচ্ছে সিলেটের আদিবাসীদের জীবন আরও কোণঠাসা হয়ে পড়েছে। মূল সম্প্রদায় কর্তৃক আদিবাসীদের শোষণ, নির্যাতন এবং রাষ্ট্র কর্তৃক বঞ্চনাই এর জন্য দায়ি। রাষ্ট্রের অস্বীকৃতির সুযোগ নিয়ে প্রভাবশালী আদিবাসী বিদ্বেষীরা আদিবাসীদের নির্যাতন ও প্রতারণা করে যাচ্ছে। কত আদিবাসী সম্প্রদায় মূলধারার সম্প্রদায় কর্তৃক শারীরিক, মানসিক এমনকি মনস্তাত্ত্বিক শোষণ ও হয়রানির শিকার হয়েছে তার সংখ্যা উল্লেখ করে শেষ করা যাবে। গণমাধ্যমে কদাচিৎ এসব বিষয়ে প্রতিবেদন আসলে সংখ্যাগরিষ্ঠ ঘটনাগুলো পর্দার অন্তরালে রয়ে যায়। আদিবাসীরা অনেক সময় লজ্জায় বা আত্মসম্মানে বাঁধে বলে প্রকাশ করেন না। আবার অনেকে মনে করেন সংখ্যালঘিষ্ঠ হিসেবে এটাই তাদের প্রাপ্য বা পরিণতি!

তিন : দেশের নাগরিক হিসেবে সিলেটের আদিবাসীরা প্রতি নির্বাচনে ভোটাধিকার প্রয়োগ করলেও তাদের ভাগ্য কখনও পরিবর্তন হয়নি। যতদিন যাচ্ছে এই আদিবাসীদের জীবন কোণঠাসা হয়ে পড়েছে। সরকারি নথিতে তারা এখন আর 'আদিবাসী' নয়; 'ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী' হিসেবে পরিচিত। তাই আদিবাসী হিসেবে তারা যে ধরনের সুযোগ সুবিধা পাওয়ার প্রত্যাশা করে সেটাও এখন অনুপস্থিত। সিলেটের অনেক আদিবাসীই বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা পান না, যারা পান তাদেরকে অনেক তদ্বির করতে হয়। এদের সংখ্যা খুব কম। এছাড়া সরকারের সামাজিক সুরক্ষা বেস্টনীতে (Social safety net) সিলেটের আদিবাসীদের অংশগ্রহণ নেই বললেই চলে। ফলে তারা নানানভাবে বিভিন্ন সুযোগ, সুবিধা, সেবা ও পরিসেবা থেকে বঞ্চিত যা, তাদের জীবিকায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারতো। অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল এই আদিবাসীরা তাই সবদিক থেকে পিছিয়ে রয়েছে। অন্যদিকে চা বাগানে বসবাসরত গারো, ওরাঁও, মুন্ডাসহ চা জনগোষ্ঠীরা সম্ভবত পৃথিবীর সবচে' কম মজুরি পাওয়া শ্রমিক। মজুরি নিয়ে চা শ্রমিক

ইউনিয়ন থেকে শুরু করে চা শ্রমিক জনগোষ্ঠীর অন্যান্য সংগঠনগুলো নানাভাবে আন্দোলন করে আসছেন। চা বাগানে একজন শ্রমিকের দৈনিক মজুরি ১২০ টাকা মাত্র! এই ১২০ টাকা সেই শ্রমিকরা পান যারা 'এ' গ্রেডের চা বাগানে কাজ করে। 'বি' বা 'সি' গ্রেডের চা বাগানে যারা কাজ করেন তারা আরও কম মজুরি পান। এছাড়া সিলেটের আদিবাসীদের এলাকায় সরকারি প্রাথমিক স্কুল হাতে গোণামাত্র। আর সরকারি ও বেসরকারি উচ্চ বিদ্যালয় নেই। তাই প্রাথমিক শিক্ষালাভের শেষে অনেক আদিবাসী শিশু শিক্ষা থেকে ঝরে পড়ে। উচ্চ বিদ্যালয়ের পড়ার জন্য হোস্টেলে থাকতে হয়। যারা আর্থিকভাবে মোটামুটি সচ্ছল তারাই সন্তানদের হোস্টেলে প্রেরণ করতে পারেন। দরিদ্র আদিবাসীদের শিশুরা তাই শিক্ষা থেকে ঝরে পড়ে প্রতিবছর। আদিবাসীদের এলাকায় সরকারি ও বেসরকারি কোন স্বাস্থ্যকেন্দ্রও নেই। তাই সঠিক চিকিৎসা না পাওয়ায় আদিবাসীরা নানান রোগে আক্রান্ত হন। অন্যদিকে প্রতিটি আদিবাসীদেরই রয়েছে নিজস্ব সাংস্কৃতিক ভাবধারা ও উপাদান। আদিবাসী দিবসে তারা বিভিন্নভাবে মূর্ত করেছেন তাদের নাচ, গান, পোশাক, ভাষাসহ বিচিত্র ভাবভঙ্গীর মাধ্যমে। এই প্রকাশ ভঙ্গি এই বার্তাই সবার কাছে প্রেরণ করতে চেয়েছে যে, আদিবাসীদের বিচিত্র ভাষা ও সংস্কৃতি রয়েছে যা, তাদের স্বতন্ত্রতা এবং 'আদিবাসীত্ব'কে প্রকাশ করে। কিন্তু দুঃখের সাথেই জানাতে হয় যে, সংরক্ষণের অভাবে আদিবাসীদের এই সংস্কৃতি ও ভাষার দিনকে দিন বিলুপ্তির দিকে অগ্রসর হচ্ছে। চর্চা ও পৃষ্ঠপোষকতার অভাব, অন্য ভাষা মাধ্যমে শিক্ষালাভ, মূলধারার সংস্কৃতির আধিপত্য এবং সর্বোপরি রাষ্ট্রের অবহেলা, অস্বীকৃতির কারণে আদিবাসীদের এ সমৃদ্ধ সংস্কৃতি বিলুপ্তির দিকে ধাবিত হচ্ছে। এছাড়া আদিবাসী শিশুদের মাতৃ ভাষায় শিক্ষা গ্রহণের জন্য বিভিন্ন উদ্যোগের কথা এ সময়ে শোনা গেলেও নানা কারণে সেটি এখনও 'উদ্যোগ'র মলাটেই আবদ্ধ আছে, বাস্তবায়নের ধারেকাছেও আসতে পারেনি। নিজের ভাষায় পড়তে না পারায় আদিবাসীদের মেধা ঠিকমতো বিকশিত হচ্ছে না ফলশ্রুতিতে চাকুরিক্ষেত্রে এবং অন্যান্য প্রতিযোগিতায় তারা পিছিয়ে পড়ে। উপরন্তু চাকুরি ক্ষেত্রে 'কোটা' পদ্ধতি বাতিলের কারণে চাকুরিলাভের ক্ষেত্রে আদিবাসীরা আরও কোণঠাসা হয়ে পড়েছে। আমরা মনে করি, প্রশাসনের সহযোগিতা পেলে, অধিকার প্রতিষ্ঠিত হলে সিলেটের আদিবাসীসহ অন্যান্য এলাকার আদিবাসীদের জীবন ও জীবিকা এত বিপন্ন হতো না, তাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবন এত কোণঠাসা হতো না!

চার. আমাকে এই লেখাটি আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস উপলক্ষে লিখতে বলা হয়েছে। তাই এই দিবসকে কেন্দ্র করে আমার কিছু পর্যবেক্ষণ তুলে না ধরে আর পারছি না। আমরা লক্ষ্য করি, প্রায় প্রতিবছরই আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবসটি পালিত হয় বেশ আড়ম্বর করে। সিলেট অঞ্চলের আদিবাসীরা ঢাকায় এসে কিংবা নিজ নিজ এলাকায় ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা সহকারে এবং হাতে নানান দাবি-দাওয়া সম্বলিত পোস্টার, ফেস্টুন, প্ল্যাকার্ড নিয়ে এ দিবসটি পালন করেন। নাচ-গান ও শান্তিপূর্ণ র‍্যালির মাধ্যমে তারা এদিন উৎসব করেন। বছরে এই একটিমাত্র দিনে আদিবাসীরা একত্র হয়ে হাতে হাত রেখে তাদের হাজারো দাবি তুলতে পারেন, তাদের ওপর নির্যাতনের ইতিহাস বর্ণনা করতে পারেন। এদিন গণমাধ্যম কর্মী থেকে শুরু করে সুশীল সমাজের একাংশও এই দাবি-দাওয়ার সাথে সংহতি প্রকাশ করেন, ছাপা ও সম্প্রচার মাধ্যমে আদিবাসীদের ছবি ও সংবাদ স্থান পায়; আদিবাসীদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় নীতিনির্ধারণী ব্যক্তিদের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য তারা জোরালো বক্তব্য দেন; দু'একদিনে এই ইস্যুটি নিয়ে আলোচনাসভা, সেমিনার হয়। জ্ঞানী ও পণ্ডিত ব্যক্তি সেই সেমিনারে আলোচনা করেন, বিভিন্ন নীতিমালা, আইন প্রণয়ন ও স্বীকৃতি প্রদানের সুপারিশ করেন। আদিবাসী নেতারাও অনেক ব্যস্ত থাকেন এ দিন। তাদের সাক্ষাৎকার নেওয়ার জন্য মিডিয়ার লোকজন বসে নেই! বিভিন্ন এনজিও যারা আদিবাসীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নয়নকল্পে 'কর্মসূচি' পরিচালনা করেন তারাও এ দিনকে কেন্দ্র করে সপ্তাহব্যাপী বা টানা দু'তিনদিন কর্মসূচি পালনের ঘোষণা করে। তবে এ পর্যন্তই। বছরের বাকি সময়টা মিডিয়ায় আদিবাসীদের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। কদাচিৎ দু'একটা খবর আসলেও সেটা ইতিবাচক নয়; নেতিবাচক। হয়তো কোনও আদিবাসী মেয়ে নির্যাতিত হয়েছে, কিংবা কোনও আদিবাসী বসতভিটা থেকে উচ্ছেদ হয়েছে অথবা কোন আদিবাসী নেতা খুন হয়েছেন ইত্যাদি জাতীয় খবর। আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবসে যাদের বঞ্চনা, প্রবঞ্চনা, শোষিত, নির্যাতিত ও হয়রানি হওয়ার কথা বলার জন্য পালন করা হয় সেই সাধারণ আদিবাসীরা কী পেলো? অনেকে বলবেন এবং বলেছেনও, আদিবাসী ইস্যু গণমাধ্যমে ব্যাপক স্থান পেয়েছে, আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আদিবাসী ইস্যুর ক্ষেত্রে আদিবাসীদের প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে, আদিবাসীরা আগের তুলনায় নিজেদের সংগঠিত করতে পেরেছেন, আদিবাসীদের দাবি-দাওয়ার সাথে সংহতি প্রকাশ করতে সুশীল সমাজের অনেকে এগিয়ে আসছেন, আদিবাসী নেতা ও গবেষকের ব্যাপক আবির্ভাব ঘটেছে, অনেক এনজিও আদিবাসীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে কর্মসূচি হাতে নিয়েছে এবং আদিবাসীরা ওই এনজিওগুলোতে 'কাজ' করার অভিগম্যতা লাভ করেছেন, আদিবাসীদের নিজস্ব রাজনৈতিক সংগঠনসহ অনেক সামাজিক সংগঠন ও এনজিও আত্মপ্রকাশ করেছে প্রভৃতি। মূলত পর পর দু'টি আদিবাসী দশক ঘোষণার পর থেকে আদিবাসী ইস্যুটি বিশ্বে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছে তা সত্যি। তবে আদিবাসী দশককে পুঁজি করে অনেকে বাণিজ্যও করেছেন, অনেকে নিজেদের অবস্থান সুদৃঢ় করার জন্য এটিকে কাজে লাগিয়েছেন, আবার অনেকে আদিবাসীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য দাতাসংস্থাদের কাছ থেকে বিপুল 'অর্থকড়ি' আদায় করতে সমর্থ হয়েছেন। এক্ষেত্রে আদিবাসী ও অ-আদিবাসী উভয় সম্প্রদায়ই এ সুযোগটি গ্রহণ করেছে। কিন্তু যাদের জন্য এই এত আয়োজন তাদের তো কিছুই হয়নি। বরং আদিবাসীরা আরও বেশি করে নির্যাতন, বঞ্চনা, শোষণ, হয়রানি ও অবহেলার শিকার হয়েছেন। প্রতিদিন পত্রিকার পাতা খুললেই কোন না কোনভাবে দেশব্যাপী আদিবাসীদের নানান নির্যাতন, উচ্ছেদ ও মানবাধিকার লঙ্ঘন সংবলিত সংবাদ দেখতে পাই এখনও! এখনও অনেক আদিবাসী ভূমি থেকে উচ্ছেদ হয়েছেন, নির্যাতনের শিকার হয়েছেন!

পাঁচ. আদিবাসীরা আশাবাদী মানুষ। নানান নির্যাতন, শোষণ, বঞ্চনার পরও তারা কখনও নিরাশ হয়নি; আশা প্রকাশ করেন একদিন না একদিন পরিস্থিতি তাদের অনুকূলে আসবে। তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে, সাংবিধানিক স্বীকৃতি পাবেন। তারা আশা করেন এরপর থেকে আদিবাসীদের জীবন-জীবিকা, পেশা বিপন্ন হবে না। আদিবাসীদের বেদখল হওয়া জমি-বসতভিটা উদ্ধারের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে, সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণকৃত জমির ন্যায্যমূল্য পাবে। ভূমি ও জীবিকার জন্য কোনও আদিবাসীর প্রাণ ঝরে যাবে না। আদিবাসী মা-বোন নির্যাতনের শিকার হবে না। কারণ আদিবাসীদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হলে, তাদের কণ্ঠস্বর শক্তিশালী হলে সহজে তাদের ওপর নির্যাতনের খড়্গ নামানোর সাহস কেউ দেখাতে পারবে না। এতে করে আদিবাসীদের অর্থনৈতিক শক্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। অর্থনৈতিক শক্তি প্রতিষ্ঠিত হলে তাদের সামাজিক চাহিদা ও প্রত্যাশাগুলোও পূরণ হবে বলে মনে করেন। আদিবাসীরা আশা করেন, সরকার আদিবাসীদের কোন এলাকায় অবকাঠামো ও পর্যটনকেন্দ্র নির্মাণ করবে না; আদিবাসীদের জন্য কোন প্রকল্প গ্রহণ করা হলে আদিবাসীদের সাথে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাগুলো পরামর্শ করবে, আদিবাসীদের জন্য ভালো হয় এমন কর্মসূচি গ্রহণ করবে। সিলেটের আদিবাসীরা এও আশা করেন সংখ্যালঘিষ্ঠ আদিবাসীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ আদিবাসীদের চাপে কোণঠাসা হবে না। মিডিয়ার কাছে আদিবাসী বলতে কেবলমাত্র চাকমা, ত্রিপুরা, গারো, মারমাদের বুঝাবে না, মাহালি, পাত্র, খারিয়া, মুন্ডা, খাসি, পাত্রসহ ৭৫টি ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ও আদিবাসী। তারা আশা করেন মিডিয়ায় সব আদিবাসীদের আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হবে, সব আদিবাসীই সমান গুরুত্ব ও সুবিধা লাভ করার অধিকার পাবে। প্রগতিশীল, চিন্তাশীল ও বুদ্ধিজীবী আদিবাসীরা একত্রে হয়ে সম্মিলিতভাবে আদিবাসীদের সমস্যা সমাধানে বুদ্ধিবৃত্তিকসহ অন্যান্য সহযোগিতা প্রদান করবেন। আদিবাসীদের এই আশা কী পূরণ হবে? হয়তো!

আদিবাসীদের ক্ষুদ্র নৃ-জনগোষ্ঠী ভাবতে সময় লেগেই যাবে

ফেলিকস আশাক্রা

৭৫’ এর কালো রাতে সপরিবারে বঙ্গবন্ধু নিহত হওয়ার পর পরই বঙ্গবীর কাদের সিদ্দীকির উপাখ্যান। তিনি দেশপ্রেমী শতশত যুবকদের সংগঠিত করেন। প্রতিবাদের “ঝড়” নিয়ে যুদ্ধ ঘোষণা করে, প্রতিবেশি রাজ্য মেঘালয়ে আশ্রয় নেন। মুক্তিযুদ্ধে যেমনটি আদিবাসী যুবকরা অংশগ্রহণ করেছিল ঠিক তেমনি এ সময়ও তারা কাদের বাহিনীতেও যোগ দেন। তৎকালীন সরকার বৃহত্তর ময়মনসিংহের ১২টি থানার সীমান্ত এলাকা জুড়ে তাদের চোরাগুপ্তা হামলাকে প্রতিহত করতে ব্যর্থ হন। যোদ্ধাদের পুর্নবাসনের বিভিন্ন পথ, ও সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করেও তাদের নিবৃত্ত করতে বা ফিরিয়ে আনা সম্ভব হচ্ছিলনা। এমনি এক দুঃসময়ে ময়মনসিংহের সার্কিট হাউসে অনুষ্ঠিত হলো এক ঐতিহাসিক বৈঠক। সেখানে মুখোমুখী হয়েছিলেন, সরকার, প্রশাসন ও আদিবাসী নেতৃবৃন্দরা।

উক্ত বৈঠকে উপস্থিত হন সরকার প্রধান এবং তৎকালীন বিডিআর মহাপরিচালক কাজী গোলাম দস্তগীর। আদিবাসীদের পক্ষে (প্রয়াত) বাবু যোয়াকিম আশাক্রা, বাবু ধীরেন্দ্র বনোয়ারী, বাবু পরেশ মৃ, বাবু সৃহৃদ গাঘ্রাসহ আরও অনেক গণ্যমান্যব্যক্তিবর্গ। সেখানে আদিবাসীদের কাদের সংগ্রামে যুক্ত হওয়ার বিষয়ে নেতৃবৃন্দের নিকট কৈফিয়ত চাওয়া হয়। বাবু যোয়াকিম আশাক্রা এবং অন্যান্য নেতৃবৃন্দ আদিবাসীদের পিছিয়ে পড়ার এবং তাদের ন্যায্য অধিকার হতে বঞ্চিত করাসহ নানান হয়রাণীর কথা তুলে ধরেন। তারা বলেন, “আদিবাসী এ দেশের নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও সরকারী চাকুরীর নানান পদসমূহে বিডিআর, আর্মি, পুলিশ, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ দেওয়া হয়না। এমনকি তাদের কৃষ্টি-সংস্কৃতির চর্চা এবং সংরক্ষণেরও কোন সুযোগ নেই।” বিষয়গুলো নেতৃবৃন্দ যথাযথভাবে উপস্থাপন করতে সক্ষম হন। জিয়াউর রহমান তখন রাষ্ট্রপতি ছিলেন। তিনি তাদের দাবীগুলো মেনে নিয়ে কার্যকরী করার আশ্বাস দিয়ে তাৎক্ষণিকভাবে ১২টি থানায় বসবাসরত আদিবাসীদের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে “ট্রাইবাল ওয়েল ফেয়ার এসোসিয়েশন” গঠনেরও পরামর্শ দেন। তারই ফলশ্রুতিতে ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন গঠিত হয় এবং এখন তা আরো শক্তিশালী সংগঠন হিসেবে চলমান রয়েছে।

পরবর্তী সময়ে আদিবাসীদের কৃষ্টি-সংস্কৃতিকে উজ্জীবিত করে তোলার উদ্দেশে নেত্রকোনার বিরিশিরিতে কালচারাল একাডেমী তৈরীসহ উচ্চতর পড়াশোনা ও সরকারী চাকুরী ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সমূহ শিথিল করে আদিবাসীদের এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করে দেওয়া হয়। উল্লেখ্য যে, ঐ বৈঠকেই আদিবাসীদের অনেক দাবী-দাওয়ার মধ্যে প্রথম শর্ত পূরণে জিয়াউর রহমান আদিবাসীদের তিনশত যুবককে বিডিআর বাহিনীতে নিয়োগ করতে কাজী গোলাম দস্তগীরকে নির্দেশ দেন। সে সুবাদেই অনেক আদিবাসী যুবক বিডিআর ও বাহিনীতে চাকুরী পান।

উক্ত বৈঠকে আদিবাসী নেতৃবর্গের উত্থাপিত দাবীগুলো মেনে নেয়ার শর্তে কাদের বাহিনীকে (আদিবাসী যুবকদের) ফিরিয়ে এনে পুনর্বাসন করার প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা চলতে থাকে। পরে তাদের পুনর্বাসনে নেওয়া হয়।

এদেশে আদিবাসীরা ইংরেজ আমল হতেই বা তারও অনেক আগে থেকেই আদিবাসী পরিচয়েই নিজেদের স্বকীয়তা বজায় রেখেই এদেশে বসবাস করে আসছে। তা আজ কারোর অজানা নেই। কিন্তু নেতৃত্বের ধারাবাহিকতায় হঠাৎ যেন ছন্দের পতন হলো। এক সময় বলা হলো, এদেশে আদিবাসী বলে কেউ নেই। রয়েছে “ক্ষুদ্র নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী।” স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, তাহলে কেনইবা আমরা “বিশ্ব আদিবাসী দিবস” পালন করছি এদেশে? জননেত্রী শেখ হাসিনার সরকার ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সার্বিক উন্নয়নে একান্তই আন্তরিক বিধায় অনেক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। তা বলার আর অবকাশ রাখেনা, এবং আমরা তার কাছে কৃতজ্ঞ। তবে সেই আবহমান কাল হতেই আমরা যেমন আদিবাসী বলে পরিচয় দিতে এবং ভাবতে অব্যস্থ। তেমনি, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী বলে নিজেকে জানতে, অনুভব করতেও হয়তো অনেক সময় লেগেই যেতে পারে। তাতে কোনই সন্দেহ নেই॥

বন্ধু-বন্ধুত্ব

সিস্টার মেবেল রোজারিও এসসি

“বন্ধু দিবস” উদ্‌যাপনে সকল শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধু/বান্ধবীদের জানাই বন্ধু প্রতিম শুভেচ্ছা, ভালোবাসা, শুভ কামনা। “বন্ধু” শব্দটি উচ্চারণ করলে মনে পড়ে আরেকটি শব্দ “বন্ধুত্ব” অর্থাৎ বন্ধু হচ্ছে ব্যক্তি আর এই ব্যক্তির সাথে যে সম্পর্ক জড়িত/যে বন্ধনে আবদ্ধ তা হচ্ছে বন্ধুত্ব। এ দু’টো শব্দ নিয়েই আমার চিন্তা-চেতনার অভিজ্ঞতার একটু সহভাগিতার বহি:প্রকাশ। ব্রতীয় জীবনে অনেকগুলো বছর পার করেছি। বাংলাদেশ, ইন্ডিয়া, ইতালীর ছাত্রজীবনে বেশ কিছু বন্ধু/বান্ধব জীবনে এসেছে যাদের সাথে পথ চলে প্রতিভা বিকাশে, জ্ঞানে-গুণে, আধ্যাত্মিকতায় সমৃদ্ধশালী হয়েছি, অনুপ্রাণিত হয়েছি এবং জীবন স্বপ্ন বাস্তবতায় পূর্ণতা পেয়েছে। তাই আমি বন্ধু-বন্ধুত্ব Friend-Friendship বিষয়টাকে এভাবে দেখি:

F = Figure of faithful love বিশ্বস্ত ভালোবাসার ভাবমূর্তি/ব্যক্তিত্ব

R = Root of joy আনন্দের শেকড়

I = Insightful personality-অর্ন্তদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব

E =Enthusiastic -প্রাণবন্ত, উদ্দীপ্ত

N = Noble in thinking-মহৎ চিন্তাশীল

D = Dynamic in life journey-জীবন যাত্রায় চলমানগতি সম্পন্ন

S = Solver of problems-সমস্যার সমাধানদাতা

H = House of Faith-বিশ্বাসের আবাসস্থান

I = Intimacy in Sharing-সহভাগিতায় আন্তরিকতা

P = Peacefulness of mind-মনের প্রফুল্লতা

বর্তমান বাস্তবতায় অন্যদের সহভাগিতা থেকে যা লব্দ/অভিজ্ঞতা করছি সেই চিন্তাধারায় বন্ধুত্ব হচ্ছে:

কাছে থাকা নয়, পাশে থাকার নামই বন্ধুত্ব।

মিথ্যে বলে মন ভোলানো নয়, সত্যি বলে সাহস যোগানোর নামই বন্ধুত্ব।

ভুল দেখে সরে যাওয়া নয়,

ভুল শুধরে দিয়ে ভালোবাসা নিয়ে পাশে দাঁড়ানোই বন্ধুত্ব।

সময়ের সাথে পাল্টে যাওয়া নয়,

সময়ের পাল্টা জবাব দেওয়ার নামই বন্ধুত্ব।

শুধু ফটো সেশনের আলোর ছটায় কাঁধে হাত রাখা নয়,

একাকীত্বের অন্ধকারে কাঁধে হাত রাখার নামই বন্ধুত্ব।

পরিশেষে এটুকু বলতে চাই বন্ধু যেন হয় আয়নার মতো স্বচ্ছ, ছায়ার মতো সার্বক্ষণিক সাথী। আর বন্ধুত্বটা যেন এমনি-ই গভীর, দৃঢ় হয় যেন আমরা বলতে পারি:

I will support you in all that you do. I will help you in all that you need. I will share with you in all that you experience. I will encourage you in all that you try. I will understand you in all that is in your heart.

আদিবাসিদের সম্পর্কে কিছু কথা

যোসেফ রায় (পল্টু)

প্রাচীনকাল থেকে যারা তাদের পূর্বপুরুষদের নিকট হতে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া জমিতে স্থায়ীভাবে বসবাস করে আসছে, নিজস্ব ভাষা, আলাদা দৈহিক গঠন বৈশিষ্ট্য ও সত্তা রয়েছে এবং যারা নিজেদের সামাজিক ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি রক্ষায় রক্ষণশীল তাদেরকে আদিবাসি জনগোষ্ঠী বুঝায়। বাংলাদেশে কখন কোন সময়, তাদের আগমন, নির্দিষ্ট করে বলা না গেলেও প্রায় ২২০ বৎসর পূর্বে ইংরেজরা ভারতের বিহার রাজ্য থেকে দক্ষিণ অঞ্চলে ও ঢাকা জেলায় আবাদী জমি তৈরি করা এবং নীলচাষ করার জন্য শ্রমিক হিসাবে একটি সম্প্রদায়কে অত্র অঞ্চলে নিয়ে আসেন। বাংলাদেশে আদিবাসিদের বহু নামে বাস। পার্শ্ববর্তীদেশ ভারতের আসাম, ত্রিপুরা রাজ্য থেকে চাকমাদের বাংলাদেশে আগমন।

চাকমাঃ পার্বত্য চট্রগ্রাম অঞ্চলের উপজাতি চাকমা, মঙ্গোলিয় জনগোষ্ঠী ভুক্ত। আদিবাসিদের মধ্যে চাকমারাই সংখ্যাগরিষ্ঠ, তারা 'চম্পক নগরের' বাসিন্দা বলে মনে করে। চাকমারা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। তিনটি দলে বিভক্ত চাকমা, তঞ্চংগা ও দৈংনাক। চাকমারা পিতৃপ্রধান পরিবারের লোক। তাদের বাসগৃহ বাঁশের মাচানের উপর তৈরি। মেয়েদের পড়ার কাপড়ের নাম 'পিনোন' মাথায় খবং' (পাগড়ি) বাঁধে। চাকমাদের শ্রেষ্ঠ উৎসব হল 'বিঝু'। বিভিন্ন ফুল, বৃক্ষ, জীবজন্তুর চোখ, পদচিহ্নের আকৃতি নকশা সম্বলিত কাপড়কে চাকমারা 'আলাম' বলে। তাছারা কুস্তি, হাডুডু এবং ঘিলা-খারা চাকমাদের জনপ্রিয় খেলা।

সাঁওতালঃ দিনাজপুর, রাজশাহী, রংপুর ও বগুড়া জেলার বিভিন্ন স্থানে সাঁওতালরা বাস করে। এদের আদি বাসস্থান ভারতের বিহার রাজ্যের সাঁওতাল পরগণায়। তারা নিজেদের বরেন্দ্র অঞ্চলের আদিবাসি বলে মনে করে। গোত্র ও উপগোত্র অনুসারে টোটেম ও টাবু আছে। একই গোত্রে বিয়ে নিষিদ্ধ। সাঁওতাল মহিলারা চাষাবাদে পুরুষের চেয়ে অধিক পরিশ্রম করে। ফাল্গুন মাস থেকে মাস গণনা করে। সাঁওতাল ছেলে-মেয়েরা উভয়ে উল্কি আঁকে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে তারা বসবাস করে। তাদের ঘরগুলো শন বা খড় দিয়ে তৈরি। ঘরে কোন জানালা থাকে না। তাদের সৃষ্টিকর্তার নাম 'ঠাকুরজিয়ো'। সাঁওতালরা পরজন্মে বিশ্বাসী। বর্তমানে অনেক সাঁওতাল খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষা নিয়েছে।

মনিপুরীঃ হবিগঞ্জ, সিলেট, মৌলবীবাজারে মনিপুরীরা বাস করে। মনিপুরী মেয়েরা

'ফানেক' (লুঙ্গীর মত কাপড়) এবং পুরুষরা ধুতি-শার্ট পরিধান করে। ওদের গায়ের রং লাল-ফর্সা, নাক কিঞ্চিৎ খাদা, চোখ ছোট, পায়ের গোড়ালি মোটা, দেহের উচ্চতা মাঝারি ধরণের। তাদের ভাষার জন্য নিজস্ব বর্ণমালা আছে। ধীলা ও পাতি এদের নিজস্ব খেলা। নৃত্য মনিপুরীদের কাছে খুব প্রিয়। 'লাই হারাউরা' নৃত্য সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য।

খাসিয়াঃ খাসিয়া সম্প্রদায় সিলেট জেলায় বাস করে। এদের মধ্যে তিনটি সম্প্রদায় দেখা যায়। খিনরিয়াম, সিন্তেৎ বা প্রার এবং ওয়ার। সিলেট সীমান্তবর্তী অঞ্চলে তারা পানের চাষ করে জীবন নির্বাহ করে। খাসিয়ারা একসময় জড়ের উপাসনা করতো। তারা মাতৃতান্ত্রিক সমাজের অনুসারী। সন্তান হওয়ার পর তারা স্বামীর ঘর করতে, স্বামীর বাড়ি যায়।

ত্রিপুরাঃ পার্বত্য চট্রগ্রামের বিভিন্ন অঞ্চলে এদের বাস। ত্রিপুরারা মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর অন্তর্গত। মেয়েরা ঘরে বসে তাঁতের তৈরি 'রেনাই' নামক ঘাগরা, খাদি, নামক বক্ষবন্ধনী ও খারকছা, নামক পাগড়ি ব্যবহার করে। তারা হিন্দু ধর্মাবলম্বী কিন্তু তাদের দেবদেবী রয়েছে। জুম চাষ করে জীবিকা নির্বাহ করে।

গারোঃ জামালপুর, ময়মনসিংহ, শেরপুর, নেত্রকোনা, টাঙ্গাইল ও সিলেট জেলার কিছু অংশে গারোদের বাস। গারোরা মঙ্গোলীয় মহাজাতির অন্তর্গত। তাদের গায়ের রং মেটে পীতাভ। এরা মধ্যমাকৃতির হয়ে থাকে। গারো সমাজের সবাই মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার অধীন। মায়েরাই গৃহ ও পারিবারিক সম্পত্তির কর্তৃত্ব পায়। পরিবারের সকল সন্তান তার পদবীতে পরিচিতি লাভ করে। মেয়েরা উত্তরাধিকারীত্ব পেলেও গারো সমাজেও পুরুষ আধিপত্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বিরাজমান। উপাসনা পুরোহিতকে খামাল নামে অভিহিত করা হয়। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পরিচালনা খামালদের কাছে ন্যস্ত অর্থাৎ এখানে পুরুষ নেতৃত্ব দানকারী।

রাখাইনঃ পটুয়াখালী, কক্সবাজার ও বরগুনা জেলায় রাখাইনরা বাস করে। রাখাইনরা মঙ্গোলীয় নৃগোষ্ঠীভুক্ত। মাচা পেতে ঘর তৈরি করে। রাখাইন মেয়েরা লুঙ্গি পরে, হাতে নাকে কোমরে ও গায়ে গয়না পরে। বিভিন্ন ধরনের খোপা বানায় ও খোপায় তাজা ফুল গোঁজা পছন্দ করে। পুরুষেরা লুঙ্গি ও ফতুয়া পরে। রাখাইন মরদেহ চিতায় পোড়ানো হয়।

লুসাইঃ এরা রাঙ্গামাটি জেলায় বাস করে। এদের মধ্যে গোত্র বিভাগ আছে, গোত্রগুলো আবার উপগোত্রে বিভক্ত। শিকার প্রথা এককালে খুবই প্রচলিত ছিল। পিতৃ প্রধান সমাজভুক্ত। একই গোত্রে বিয়ে তাদের রীতিবিরুদ্ধ।

লুসাইদের মেয়ে পুরুষ উভয়েই দীর্ঘ চুল রাখে এবং মাথার পেছনের দিকে খোঁপা বাঁধে। তারা জুম চাষের ওপর নির্ভরশীল। শত্রুমুক্ত রাখার জন্য এরা উচুঁ পাহাড়ে গ্রাম তৈরি করে। গ্রামের

চারিদিকে শক্ত গাছের খুটি পুঁতে বেষ্টনী তৈরি করে। মেয়েদের বাঁশ-নৃত্য বিখ্যাত।

ওরাওঁঃ রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়া ও রাজশাহী জেলার বিভিন্ন স্থানে তাদের বাস। ওদের সৃষ্টিকর্তার নাম 'ধরমেশ'। তাদের বহু দেবদেবী আছে। বিভিন্ন গোত্রে ওরা বিভক্ত। একই গোত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ। গোত্রগুলো গাছ-গাছরা, পশু-পাখি, জন্তু জানোয়ার ইত্যাদি নামে পরিচিত। ওরাওঁদের মৃতদেহ পোড়ানো হয়। ওদের গ্রামে একটি করে বৈঠক ঘর আছে। এখানে পূজা-পার্বণ, ব্রত অনুষ্ঠান ছাড়াও গ্রাম্য সালিশ দরবার বা বিচার-আচার সমাধা করা হয়। তাদের ভাষা কুরুখ ও পাদ্রী নামে পরিচিত।

মারমাঃ কক্সবাজার ও পটুয়াখালীতে তাদের বাস। মারমারা মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর। তারা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। মারমা মেয়েরা সাজগোজ করতে ভালোবাসে এবং বিভিন্ন ধরনের আকর্ষণীয় খোঁপা বাঁধে। তারা পিনন ও খাদি পরে। ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের মধ্যে তারা বিয়ে করে না। এরা জুম চাষের উপর নির্ভরশীল। এদের মৃতদেহ দাহ করা হয়।

তঞ্চংগাঃ চাকমাদের সাথে এদের কিছু মিল আছে। সাবেক পার্বত্য চট্টগ্রামে এদের বাস। চাকমা ও তঞ্চংগাদের মধ্যে বিয়ে হয়। মেয়েদের খাদি (বক্ষবন্ধনী) কালো কিংবা লাল বর্ণের হয়। তঞ্চংগাদের মধ্যে স্বামীর বয়স স্ত্রীর বয়সের চেয়ে কম হয়। এরা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। জুম চাষের উপর নির্ভরশীল। ভাত ও মদ এদের প্রিয় খাদ্য।

কুকিঃ বান্দরবান জেলায় এদের বাস। মাথা ছোট, দৈর্ঘ্যে খাটো, খায়ের রং কালো। বিয়ের ব্যাপারে তারা সাধারণত গোষ্ঠীর বাইরে থেকে স্ত্রী গ্রহণ করে থাকে। বিধবা বিয়ে এবং তালাক প্রথা প্রচলিত। মেয়েরা ও পুরুষেরা দীর্ঘ চুল রাখে। লুসাইদের মতো এরা স্নানের সময় মাথায় পানি ব্যবহার করে না। খোঁপায় রৌপ নির্মিত বিবিধ কাঁটা ব্যবহার করে। পুরুষরা লেংটি এবং মেয়েরা মুরংদের ন্যায় খর্বাকৃতির বস্ত্র ব্যবহার করে। মৃতদের কবর দেওয়া হয় এবং পরজন্মে বিশ্বাসী।

চাকঃ চাকরা বান্দরবান জেলায় বাস করে। সমগোত্রে তাদের বিয়ে নিষিদ্ধ। বিয়ের একবৎসর পরে সন্তান সহ বাপের বাড়িতে আনুষ্ঠানিকভাবে বেড়াতে যায়। সেই সময় পিতা-মাতাদের কাছে তাদের সম্পত্তির ভাগ চায়। চাকরা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। মৃত্যুর পর এদের দাহ করা হয়।

মুরংঃ বান্দরবান এলাকায় মুরংদের বাস। এরা নিগ্রোবটু শ্রেণীর মানবগোষ্ঠী। এরা জড়োপাসক কিছু মুরং বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। গোত্রে গোত্রে বিয়ের রীতি প্রচলিত। মুরং মেয়েরা 'ওয়াংলাই' নামে নয় থেকে এগারো ইঞ্চি চওড়া বস্ত্র ব্যবহার করে। মেয়ে-পুরুষ উভয়েই বিচিত্র ধরনের রুপার গয়না ও পুঁতির মালা ব্যবহার করে। ব্যাঙ, শূকর ও শুটকি মাছের পচানো চর্বি দিয়ে এরা 'নাপপি' তৈরি করে ॥ ৯০

জীবনের স্বপ্ন

তৃণা ক্রুশ

স্বপ্নে ভরা কত এই সুন্দর জীবনটাতে
যখন দুঃখের পাহাড় এসে হানা দিয়েছে
সবাই তখন পর হ'য়ে দূরে চলে গেছে।

কষ্ট যখন মনের মাঝে দিয়েছে ব্যথা
চোখের জল লুকিয়ে হৃদয়ে কেঁদেছি একা
সম্পর্কের কথা তখন সবাই ভুলে যায়।

সজিব পাতাটি ঝড়ে গিয়ে ভাবে নীরবে
পৃথিবীর মাঝে আর কিছুদিন যদি পারতো
সৌন্দর্য্যের স্মৃতি নিয়ে একটু বেঁচে
থাকতে।

হয়তো আমিও সবার অন্তরালে নীরবে
একদিন ঝড়ে যাব পৃথিবী বুক থেকে
জীবনের স্বপ্নগুলো মাটি চাপা দিয়ে।

অনন্ত যাত্রায়

সিস্টার মেরী বার্নার্ড এসএমআরএ

সিস্টার মেরী বার্নার্ড এসএমআরএ (বার্নাডিন বেনী কস্তা) ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দের ১৫ অক্টোবর রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লীর ছোট সাতানী পাড়া গ্রামে পিতাঃ মংলা মার্টিন ডি কস্তা ও মাতাঃ মারীয়া বির্জিনা গমেজ এর কোল আলো করে এ ধরায় আগমন করেন। তিনি তার শিক্ষা জীবন সমাপ্ত করে ঈশ্বরের আহ্বানে সাড়া দেবার লক্ষ্যে ১৯৪৬ খ্রিস্টবর্ষের ৬ জুলাই প্রেরিতগণের রাণী মারীয়ার সঙ্গিনী সংঘে যোগদান করেন। অতপর গঠনকাল সমাপ্ত করে ১৯৪৯ খ্রিস্টবর্ষের ৬ জানুয়ারি প্রথম ব্রত ও ১৯৫৫ খ্রিস্টবর্ষের ৬ জানুয়ারি আজীবন ব্রত গ্রহণ করেন।

সিস্টার মেরী বার্নার্ড ১৯৪৯ খ্রিস্টবর্ষ হতে ২০১০ খ্রিস্টবর্ষ পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে বটমলী হোম, তুমিলিয়া, মঠবাড়ী, মেরী হাউজ, ময়মনসিংহ, রাণীখং, দরগাচলা, বানিয়ারচর, তেজগাঁও, ধরেন্ডা ও মরিয়মনগর আশ্রমে দীর্ঘ সময় ভিন্ন ভিন্ন ভাবে মফঃস্বলে পালকীয় কাজে, আশ্রম সেবায়, কখনো আশ্রম পরিচালিকা হিসেবে আবার কখনো শিক্ষিকা হিসেবে নিজেকে অকৃপণভাবে দান করেছেন প্রভুর দ্রাক্ষাক্ষেত্রে। তিনি ২০১১ খ্রিস্টবর্ষ হতে বার্ধক্যজনিত কারণে মাতৃগৃহের শান্তিভবনে অবস্থান করেন। এখানে অবস্থানকালীন সময়ে তিনি ধ্যান-প্রার্থনা এবং ছোট ছোট গৃহকর্মে সর্বদাই নিজেকে আত্মনিয়োগ করেছেন। শেষ কয়েকটি বছর পুরোপুরি বিছানায় থেকে গত ৯ জুলাই শনিবার, ২০২২ খ্রিস্টবর্ষের ভোর ৫টায় প্রভুর ডাকে সাড়া দিয়ে অনন্ত যাত্রায় পাড়ি দেন। ঐদিনই বিকেলে এসএমআর এ পরিবারের নিজস্ব কবরস্থানে বিশেষ প্রার্থনা ও খ্রিস্টযাগের মাধ্যমে তাকে সমাহিত করা হয়।

ব্যক্তিজীবনে সিস্টার মেরী বার্নার্ড ছিলেন একজন সহজ সরল, রসিক, সদালাপী, মিশুকে, উদার, দয়ালু ও বিনয়ী। প্রার্থনা ও ব্রতীয় জীবনে তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিশ্বস্ত, সংঘবদ্ধ জীবনে সবাইকে নিয়ে একসাথে কাজ করা ও বাস করার এক অদম্য উৎসাহ, উদ্দীপনা সিস্টারের মধ্যে বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় ছিল। একই সাথে মফঃস্বলে পালকীয় কাজের প্রতি তাঁর ভালবাসা ও আন্তরিকতা ছিল অপরিসীম। তিনি যে কোন প্রয়োজনে দরিদ্র ও অভাবী মানুষের পাশে থাকতেন, মন দিয়ে তাদের কথা শুনতেন ও পরামর্শ দিতেন। তিনি ধর্মপল্লীর পালকদের সাথে মফঃস্বল এলাকায় একাত্ম হয়ে কাজ করতে ভালবাসতেন। দীন দরিদ্র মানুষের প্রতি তার ভালবাসা ও সেবার মনোভাব সত্যিই অতুলনীয় এবং প্রশংসনীয়। তিনি তার ছোট ছোট লিখনী ও চিঠির মাধ্যমে হাস্যরসাত্মক কথা দিয়ে সর্বদা সবাইকে আনন্দ দিতেন।

তিনি একজন প্রকৃত সন্ন্যাসব্রতিনী ও প্রার্থনার মানুষ। দীন দরিদ্র মানুষের সাথে কাজ করার অদম্য আগ্রহ ও জ্বলন্ত ভালবাসা আমরা শ্রদ্ধেয়া সিস্টারের মধ্যে সব সময়ই দেখেছি। এছাড়াও তিনি শিশুদের পাপস্বীকার ও হস্তার্পনের জন্য প্রস্তুত করতেন এবং শিশুদের যিশুর গান শেখাতে পছন্দ করতেন। তিনি সেমিনারীয়ান, গঠনপ্রার্থী ও ফাদারদের খুব স্নেহ করতেন। তাদের জন্য প্রার্থনা করতেন এবং খোঁজ খবর নিতেন। আত্মীয় পরিজন ও পরিচিত মানুষের প্রতি ছিল তার অপরিসীম দরদ ও সহানুভূতি। ধনী গরীব ভেদাভেদ না করে সবাইকে ভালবাসতেন ঈশ্বর সন্তান হিসেবে। সিস্টার মেরী বার্নার্ড এর অনুগৃহীত ও ভালবাসাময় নিবেদিত জীবনের জন্য আমরা প্রভুর ধন্যবাদ ও প্রশংসা করি। প্রার্থনা করি ঈশ্বর যেন তার এ ভক্তসেবিকাকে স্বর্গসুখ ও অনন্ত শান্তি দান করেন ।

- সিস্টার মেরী হেনরীয়েটা এসএমআরএ

বিজ্ঞ/২২০/২২

দ্রাক্ষাক্ষেত্রের বিশ্বস্তকর্মী ফাদার আলেক্স রাবানল

ফাদার গৌরব জি পাথাং সিএসসি

ছিলেন কৃষিবিদ আর হলেন প্রভুর দ্রাক্ষাক্ষেত্রের বিশ্বস্তকর্মী। ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে আলেক্স রাবানল নামে একজন বিশিষ্ট কৃষিবিদ সাধারণ মিশনারী হিসেবে সেবাকাজ করার জন্য পবিত্র ক্রুশ সম্প্রদায়ের আহ্বানে সাড়া দিয়ে পূর্ব বাংলার বরিশালের পাদ্রিশিবপুরে অবস্থিত সেন্ট আলফ্রেড হাইস্কুলে আসেন। বর্তমান কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও সিএসসি তারই ছাত্র ছিলেন। আলেক্স রাবানলের জন্ম ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দের ১১ জানুয়ারি ফিলিপাইনের আলোমিনোস পানগাসিনান নামক স্থানে। পরিবারের আট ভাই-বোনের মধ্যে তিনিই একমাত্র ছেলে এবং প্রথম সন্তান। হাইস্কুলের শিক্ষা জীবন শেষে তিনি আরেনেতা বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকুরি করেন। তিনি দিনে খামারে গবেষণার কাজ করতেন আর রাতে পড়াশোনা করতেন। পড়াশোনার পাশাপাশি তিনি সেবামূলক কাজও করতেন। ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি আরেনেতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে কৃষি বিষয়ের উপর এমএ ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি উদ্ভিদ বিদ্যায় বিশেষ দক্ষতা ও পারদর্শিতা অর্জন করেন। বিশ্ববিদ্যালয় হতে এমএ ডিগ্রি লাভের পর তিনি পূর্ব বাংলার বরিশালের পাদ্রিশিবপুরে অবস্থিত সেন্ট আলফ্রেড হাইস্কুলে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। স্কুলে অবস্থানকালে প্রথমেই প্রাইমারী ও হাইস্কুলের জন্য কৃষি শিক্ষার উপর একটি পাঠ্যক্রম বা সিলেবাস তৈরী করেন এবং সেই পাঠ্যক্রম সেন্ট আলফ্রেড স্কুলেই প্রথম চালু করেন। কয়েক বছর পর সরকার সেই পাঠ্যক্রম গ্রহণ করেন এবং কয়েকটি স্কুলে তা চালু করেন। সরকার ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তা চালু রাখেন এবং পরবর্তীতে এই সিলেবাস আধুনিকীকরণ করে ব্যবহার করেন। এই সময় তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামের বান্দরবান এলাকার আদিবাসীদের মাঝেও কাজ করেন। তিনি কৃষক, ছাত্র ও গ্রামের সাধারণ মানুষের সাথেও নানা সেবাকাজে নিজেকে নিয়োজিত করেন। তিন বছরের চুক্তি শেষে ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে তিনি আবার নিজ দেশে ফিরে যান। পবিত্র ক্রুশ সম্প্রদায়ের ফাদার ও ব্রাদারদের সাথে কাজ করতে করতে তার মনেও যাজক হবার বাসনা জেগে ওঠে। কিন্তু পরিবারের একমাত্র ছেলে সন্তান হওয়ায় পিতা-মাতা ও আত্মীয় স্বজনদের অনুরোধে তিনি বিয়ে করতে সম্মত হন। তাই তিনি মিলাগ্রোস নামক এক মেয়েকে বিয়ে করেন। ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে তিনি আবার টাঙ্গাইল জেলার মধুপুর এলাকায় ফাদার ইউজিন হোমরিকের সাথে সেবাকাজ করার জন্য বাংলাদেশে আসেন। সেই সময় হোস্টেলে ছাত্র ছিলেন বর্তমান বিশপ পল পনেন কুবি সিএসসি, ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশ। আলেক্স রাবানল মধুপুরে এসে আধুনিক পদ্ধতিতে আনারস, আলু, বিভিন্ন সবজি, ফল-মূল চাষাবাদ করতে গ্রামের জনগণকে শিখিয়েছেন এবং নিজেও সারাদিন মাঠে থেকে কাজ করেছেন। কৃষিবিদ হিসেবে তিনি ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে ছয় মাসের জন্য নেদারল্যান্ডে অবস্থিত আন্তর্জাতিক কৃষি রিসার্চ সেন্টারে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন এবং তিনি বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন।

আদর্শ পিতা: তিনি তিন সন্তানের জন্য এক আদর্শ পিতা ছিলেন। তার প্রিয়তমা স্ত্রী মিলাগ্রোস মারা যাবার পর সন্তানদের দায়িত্ব নিতে অবহেলা করেননি। তিনি সন্তানদের বাংলাদেশে নিয়ে এসে পড়াশোনা শিখিয়ে মানুষ করে গড়ে তুলেছেন। সন্তানদের খ্রিস্টীয় শিক্ষা-দীক্ষা দান করেছেন। পিতা হিসেবে যা যা করা দরকার সবই করেছেন। পিতা হিসেবে দায়িত্ব পালনের পরই সন্তানদের কাছ থেকে এবং সংসারমুক্ত হয়েছেন। তিনি যিশুকে ভালবেসে সংসারত্যাগী হয়েছেন।

কৃষিতে তার অবদান: কৃষি আধুনিকায়নে এবং উন্নতিতে ফাদার আলেক্স রাবানল অনেক ভূমিকা রেখেছেন। তিনিই প্রথম কৃষি শিক্ষার জন্য পাঠ্যক্রম তৈরি করেছেন এবং কৃষি শিক্ষায় লোকদেরকে অনুপ্রাণিত করেছেন। পুরাতন ও অনুন্নত পদ্ধতিতে চাষাবাদ ছেড়ে লোকদেরকে বিজ্ঞানসম্মত ও আধুনিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ করার জন্য লোকদেরকে শিখিয়েছেন। তিনি ফিলিপাইনের আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা কেন্দ্র থেকে কুমিল্লা বার্ড-এ আসা বিশেষজ্ঞ টিমের একজন সদস্য ছিলেন। কথিত আছে যে, তিনি ফিলিপাইনের আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা (ইরি) কেন্দ্র থেকে পকেটে লুকিয়ে ইরি ধান নিয়ে এসেছিলেন এবং বাংলাদেশে প্রচলন করেছেন। শুধু তাই নয়, ফলের চাহিদা পূরণের জন্য তিনি কিছু বীজও নিয়ে এসেছিলেন এবং পরীক্ষামূলকভাবে চাষাবাদ শুরু করেছেন। তার মধ্যে ট্যাং ফল, রাম্বুটান ফল, অ্যাভোকাডো ফল, পীস ফল, শিমূল আলু প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। মধুপুর এলাকায় আনারস, আলু, ধান প্রভৃতি কিভাবে আরো বেশি করে ফলানো যায় তার জন্য অনেক পরিশ্রম করেছেন এবং লোকদেরকে শিখিয়েছেন।

কষ্টযন্ত্রণার মধ্যে নতুন আহ্বান: ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে আলেক্স রাবানলের প্রিয়তমা স্ত্রী মিলাগ্রোস এক দুরারোগ্য ব্যধিতে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। আলেক্স রাবানল তখন তার তিন সন্তানকে বাংলাদেশে নিয়ে আসেন এবং এখানেই লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করার পর সন্তানদের নিজ দেশ ফিলিপাইনে পাঠিয়ে দেন। সংসারের দায়িত্বমুক্ত হবার পর তিনি পবিত্র ক্রুশ সম্প্রদায় এবং মণ্ডলীর কাছে যাজক হবার জন্য ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। তার জীবন-যাপন ও সেবাকাজ পর্যবেক্ষণ করে পবিত্র ক্রুশ সংঘ তাকে মনোনয়ন দেন। আলেক্স রাবানল ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে পবিত্র ক্রুশের অনুমোদন পেয়ে নব্যালয়ে প্রবেশ করেন। দশ মাস পর তিনি ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দের ২৬ অক্টোবর ১ম ব্রত গ্রহণ করেন। পরে তাকে ভারতের পুনে সেমিনারীতে ঐশতত্ত্ব পড়াশোনার জন্য পাঠানো হয়। ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি ঐশতত্ত্ব পড়াশোনা সমাপ্ত করে দেশে ফিরে আসেন এবং মধুপুরের জলছত্র মিশনে অবস্থান করেন। ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দের ১৯ সেপ্টেম্বর তিনি আজীবন সন্ন্যাস ব্রত গ্রহণ করেন। ২০ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে পরিসেবক হিসেবে অভিষিক্ত হন। ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দের ১৮ জানুয়ারি বিশপ ফ্রান্সিস গমেজ কর্তৃক যাজক অভিষেক লাভ করেন।

আদর্শ যাজক: ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে যাজকীয় অভিষেকের পর তিনি জলছত্র মিশনেই সহকারী পালক-পুরোহিত হিসেবে ফাদার ইউজিন হোমরিকের সাথেই সেবা কাজ করেন। পরে ১৯৯০-১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ফাদার আলেক্স রাবানল জলছত্র ধর্মপল্লীর পালক-পুরোহিত হিসেবে দায়িত্ব পান।

১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি গৌরনদীর যিশু হৃদয়ের ধর্মপল্লীতে পালক-পুরোহিতের দায়িত্ব পান। ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি নোয়াখালির লুর্দের রাণী মারীয়ার ধর্মপল্লীতে পালক-পুরোহিতের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯৬-১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দে আবার তিনি গৌরনদীতে পালক-পুরোহিতের দায়িত্ব পান। ১৯৯৮-১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি একই ধর্মপল্লীতে সহকারী পালক-পুরোহিত হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯৯-২০১১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশের মরিয়ম নগর সাধু জর্জের ধর্মপল্লীতে পালক পুরোহিত হিসেবে সেবাকাজ করেন। সেখানে থাকতেই তিনি দিগলাকোণা নামক স্থানে নতুন ধর্মপল্লী প্রতিষ্ঠা করার স্বপ্ন দেখেন। তার স্বপ্ন ২০১১ খ্রিস্টাব্দে পূরণ হয়। ২০১১-২০১৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি ঐ ধর্মপল্লীতে পালক পুরোহিত হিসেবে সেবাকাজ করেন। ২০১৬-২০১৮ পর্যন্ত তিনি আবার সাধু জর্জের ধর্মপল্লী মরিয়ম নগরে পুরোহিত হিসেবে সেবাকাজ করেন। পরে বার্ধক্যজনিত কারণে ২০১৮ খ্রিস্টাব্দে রামপুরায় আসেন। অবশেষে তিনি বিগত ৩ এপ্রিল ২০২২ খ্রিস্টাব্দে সেন্ট জন ভিয়ান্নি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে পিতা ঈশ্বরের কোলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তার মৃত্যুর খবর পেয়ে মধুপুর এলাকা, মরিয়ম নগর ও দিগলাকোণা এলাকায় অসংখ্য লোক তাকে দেখার জন্য ও শ্রদ্ধা জানানোর ছুটে আসেন।

আচ্ছু ফাদার: মান্দি ভাইবোনেরা ফাদার আলেক্স রাবানলকে ভালবেসে 'আচ্ছু' ফাদার (দাদু ফাদার) বলে ডাকতেন। আচ্ছু ফাদার মান্দিদেরকে আপন করে নিয়েছিলেন এবং মান্দিরাও তাকে নিজেদেরই বলে গ্রহণ করেছিলেন। আচ্ছু ফাদার মান্দি ভাষায় কথা বলতে পারতেন। তার চেহারা দেখতে মান্দিদের মতই ছিল। আচ্ছু ফাদার মান্দিদের কৃষ্টি-সংস্কৃতিকেও খুব ভালবাসতেন। অসুস্থ হয়ে থাকার সময় তিনি মান্দিদের সান্নিধ্য পেতে চাইতেন, কেউ দেখতে এলে খুবই খুশি হতেন।

একটি সাক্ষাৎকার: রামপুরা থাকালীন সময় দৈনিক যুগান্তরের সাংবাদিক খাদিজা আক্তার মুন্নীকে সঙ্গে নিয়ে একটি সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম। তা প্রকাশিত হয়েছিল ১৮ আগস্ট, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে। সেখানে তিনি ব্যক্ত করেছিলেন বাংলাদেশের প্রতি তার ভালবাসা, বাংলার মানুষ ও কৃষ্টি সংস্কৃতির প্রতি তার ভালবাসা। খাবার-দাবার, প্রশাসন, চিকিৎসা ও শিক্ষা সব কিছুই নিজের বলে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "বাংলা জানলে ঢাকায় চলতে সমস্যা হয় না।" তিনি ব্যক্ত করেছিলেন বাংলাতেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে চান। তার সেই শেষ ইচ্ছা পূরণ হয়েছে বাংলার মাটিতে শায়িত হয়ে। প্রার্থনা করি, ঈশ্বর তাঁর এ সেবককে যোগ্য পুরস্কার দান করুন ॥

উত্তম ব্যক্তি হয়ে ওঠার উপায়

সিস্টার মেরী জেনিফার এসএমআরএ

প্রত্যেক মানুষই তার জীবনে সুখী হতে চায়,সাফল্য লাভ করতে চায় এবং সেই সাথে অন্যের ভালবাসাও চায়। এই তিনটা জিনিস পেতে হলে একজন Perfect বা উত্তম ব্যক্তির অধিকারী হতে হবে। আমরা প্রত্যেকেই বিশ্বাস করি যে,ছোট থেকেই বৃহৎ কিছুর সৃষ্টি হতে পারে। কথায় আছে,'ছোট ছোট বালুকণা বিন্দু বিন্দু জল, গড়ে তোলে মহাদেশ সাগর অতল"। অর্থাৎ আমি যদি আমার নিজের সুক্ষ্ম দোষ-দুর্বলতাগুলো বা যেসব বিষয়গুলো একজন ভাল ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠতে আমাকে বাঁধা দান করছে, তা যদি শুধরে নিতে চেষ্টা করি, তাহলেই আমি হয়ে উঠতে পারব একজন ভাল ব্যক্তিত্বের মানুষ,যা হয়ে ওঠার জন্য আমি/আমরা স্বপ্ন দেখি। কয়েক-টি দিক দেখানো হলো, যা অনুশীলনের মধ্যদিয়ে একজন উত্তম ব্যক্তি হয়ে ওঠা সম্ভব।

(১) শিকড়ে ফিরে যাওয়া: একজন ভাল মানুষ হওয়ার জন্য আমাকে প্রথমেই মূলে বা শিকড়ে ফিরে যেতে হবে। ফিরে দেখতে হবে আমি কে? কোথায় আমার জন্ম? আমার পারিবারিক ব্যাক-গ্রাউণ্ড কী? কি পরিস্থিতিতে আমার জন্ম হয়েছে? সুখের এবং দুঃখের পরিস্থিতিতে আমার আবেগ কেমন হয়? আমি আমার আবেগগুলোকে দমিয়ে রাখি নাকি আবেগ অনুসারে প্রতিক্রিয়া করি? অনেক সময় দেখা যায় পরিবশেগত কারণে জন্ম থেকেই আমাদের ব্যক্তিত্ব অন্যরকম হয়ে থাকে। অর্থাৎ একজন সন্তান যখন মায়ের গর্ভে থাকে,-তখন মা যদি শারীরিক/মানসিক নির্যাতন পেয়ে সন্তান জন্ম দান করেন তাহলে তার ব্যক্তিত্ব হবে কিছুটা ভীতু প্রকৃতির। আবার অনেক সময় যারা Unwanted Baby, এদের ব্যক্তিতের মধ্যে প্রকাশ পাবে হীনমন্যতা, নিজেকে লুকানোর স্বভাব কিংবা স্বীকৃতি না পাওয়ার অভাব। এসব কারণে ব্যক্তিত্বের গঠন বিভিন্ন রকম হয়। তাই যখন আমি/আমরা নিজেকে বুঝতে পারব যে, আমি কোন্ অবস্থানে আছি,তখনই আরা এগুে-লাকে কাটিয়ে উঠতে পারব।

(২) রাগ নয়, ক্ষমা করা: যখন আমরা রাগের উর্ধ্বে অন্যকে ক্ষমা করতে পারি,তখনই আমরা সুখি হতে পারব এবং আমাদের মনে জমে থাকা মেঘ কেটে আলো ফুটে উঠবে। যখন আমরা অন্যের কাছ থেকে খুব বেশি আঘাত পাই, বিশেষ করে যাদের সাথে আমাদের খুব ভাল সম্পর্ক ছিল, তাদের কাছ থেকে অপ্রীতিকর, তিক্তময় ব্যবহার পাওয়ার ফলে তাদেরকে আমরা ক্ষমা করতে পারি না। আর ক্ষমা না করার কারণে আমাদের হৃদয় ও মনে সৃষ্টি হয় বড় ধরণের ক্ষত। যার ফলে মানসিক অসুস্থতার পাশাপাশি আমাদের শরীরে নানা রকম রোগ যেমন- স্বাস্থ্য ভেঙ্গে যাওয়, হার্ট এ্যাটাক, এমনকি আমাদের ঘুমেরও ব্যাঘাত ঘটে। তাই এসব থেকে মুক্তি লাভের জন্য মন থেকে অপরকে ক্ষমা করতে হবে, দ্বন্দ্ব নিরসন করতে হবে, হীনমন্যতাকে কাটিয়ে উঠতে হবে এবং সব রকম নেতিবাচক চিন্তা বাদ দিতে হবে। তাহলেই আমরা মানসিক শান্তি লাভ করতে পারব এবং সব রকম অসুস্থতা থেকে মুক্তি লাভ করতে পারব।

(৩) দায়িত্ব গ্রহণ করা: একজন উত্তম ব্যক্তিত্ব হয়ে ওঠার প্রধান চাবি হলো, দায়িত্ব গ্রহণ করা। তিনি-ই দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারে, যার মধ্যে দায়িত্ব গ্রহণের মনোভাব রয়েছে। যে তার আচরণ/আবেগ/অনুভূতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এবং ব্যর্থ্যতা থেকে নতুন কিছু শিক্ষা লাভ করতে পারে। দায়িত্ব গ্রহণ করা মানে-দায়িত্বশীল ব্যক্তি হয়ে গড়ে ওঠা। ছোট ছোট দায়িত্ব গ্রহণ আমাদেরকে বড় দায়িত্ব গ্রহণের যোগ্যতা দান করে।

(৪) ভালো শ্রোতা হওয়া: ভালো শ্রোতা হওয়ার জন্য খোলা মনের অধিকারী হতে হবে। যখন আমরা অন্যের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনি, তখন আমি অন্যকে খুব ভালভাবে বুঝতে ও চিনতে পারি এবং তার কাছ থেকে অনেক জ্ঞানও লাভ করতে পারি। ফলে তার সাথে আমার সম্পর্ক আরো সুন্দর ও গভীর হয়। ভালো শ্রোতা হওয়া মানে অন্যকে প্রাধান্য দেওয়া বা অন্যের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া। অন্যের জীবনে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন সফলতা/ব্যর্থতার বাস্তব ঘটনা শ্রবণের মধ্যদিয়ে নিজের জীবনের জন্য শিক্ষা লাভ করা।

(৫) ভদ্র হওয়া: ভদ্র আচরণের মধ্যদিয়ে আমরা অনেকের প্রীতিভাজন/প্রিয়জন হয়ে উঠতে পারি। যখন আমরা অন্যের সাথে সাধারণ কথায় 'Thank You,Please,Sorry' এই ছোট ছোট শব্দগুলো ব্যবহার করি,তখন এই ছোট ছোট শব্দগুলোই আমাকে অন্যের কাছে ইতিবাচক মনোভাব তৈরি করবে। ক্লান্তিপূর্ণ সময়ে পেট ভরে ভাত খাওয়ার চেয়ে এক কাপ কফি যেমন আমাদের শরীরে বেশি শক্তি যোগায় ও শরীরে প্রভাব বিস্তার করে, ঠিক তেমনি আমার ভদ্র আচরণও অন্যের মনে খুব বেশি দাগ কাটে। তাই উত্তম ব্যক্তিত্ব লাভের একটি অন্যতম পথ হলো ভদ্র হওয়া/নমনীয় হওয়া।

(৬) লক্ষ্য স্থির করা: প্রত্যেকেরই একটি চুড়ান্ত লক্ষ্য থাকা উচিত। লক্ষ্যহীন মানুষ কোনদিন উন্নতির শিখরে পৌছতে পারে না। মাঝি ছাড়া নৌকা কোনদিন তার সঠিক গন্তব্যে পৌছতে পারে না, নদীতে শুধুই ঘুরপাক খেতে থাকে, অনেক সময় ঢেউ এসে নৌকাটিকে ডুবিয়ে দিয়ে যায়। ঠিক তেমনি আমাদের জীবনেরও সঠিক কোন লক্ষ্য না থাকলে মাঝপথে আমরাও ডুবে যাব, হারিয়ে যাব বিলাসিতার মোহে। তাই জীবনে বড় হতে চাইলে, সুখ্যাতি লাভ করতে চাইলে জীবনের জন্য একটি সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে ও সেই লক্ষ্য বা স্বপ্নকে বাস্তবে রূপদানের জন্য চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

(৭) সমঝোতায় বসবাস করা: যখন আমরা অন্যের সাথে সমঝোতায় বসবাস করব,তখন আমাদের জীবনটা হয়ে উঠবে আরও আনন্দময়। আমরা দাঁড়িপাল্লার দিকে তাকালে লক্ষ্য করব, দাঁড়িপাল্লার দুইপাশ সমান থাকলে যেমন দেখতে ভাল লাগে, তেমনি অন্যের সাথে যদি সুন্দর সম্পর্ক বজায় রাখেতে চাই,অন্যের দোষ-দুর্বলতাগুলো আমাকে গ্রহণ করতে হবে। অন্যে যেমন আছে, সেভাবেই তাকে গ্রহণ করতে হবে।

পরিশেষে বলতে চাই,উত্তম ব্যক্তি হওয়া আমাদের সকলেরই কাম্য। যে কয়েকটা বিষয় দেখানো হলো,আমরা যদি আমাদের প্রত্যহিক জীবনে তা অনুশীলন করি তাহলে আমরা প্রত্যেকেই একজন উত্তম ব্যক্তির অধিকারী হয়ে উঠতে পারব ॥

অকাল অপরিপক্ক

সাগর কোড়াইয়া

ভেবেছিলাম আমাদের বন্ধুটি বিয়ের জন্য কখনো মেয়ে পাবে না। ডিগ্রী পড়ার সময়ে এত করে বলতাম প্রেম করতে। কিন্তু তার একই উত্তর, পড়াশুনার ক্ষতি হবে। তাই প্রেমের পথে পা না বাড়িয়ে বরং পড়াশুনায় নিবিষ্ট চিত্তে যত ঘৃতাহুতি দেবার দিলো। বন্ধুর অধ্যবসায়ী মনোভাব দেখে আমাদের ভালোই লাগতো। ভাবতাম, এবার বুঝি ওর কাছ থেকে পরীক্ষায় প্রথম বিভাগ কেউ কেড়ে নিতে পারবে না। কিন্তু ফলাফলে সেই আমাদেরই মতো।

যদি কখনো বলতাম, দোস্ত চলো ঘুরে আসি। একবাক্যে আমাদের প্রত্যাখান করতো। বলতো, দেখ্‌ছিস না পড়াশুনা করছি। কি আর করবো ব্যথিত মনে ফিরে আসতাম।

মাঝে মাঝে আমাদের বন্ধুটি এমন সব উদ্ভট গালি দিতো যে শুনে কখনো রাগ করতে পারতাম না। বরং হেসে উড়িয়ে দিতাম। কখনো কখনো আমরা তার ঐ গালিগুলো নকল করে তাকেই শুনাতাম। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় বন্ধুটি কখনো রাগ করতো না। বরং বলতো, তোরা আমাকেই আমার গালিগুলো শুনাচ্ছিস?

আমাদের বন্ধুটিকে আমরা বস্ বলে সম্বোধন করতাম। বেশ খুশিই হতো সে ডাক শুনে। শুদ্ধ বাংলায় কথা বলতে সব সময় চেষ্টা করতো বন্ধুটি। কিন্তু আঞ্চলিক যে টান তা কিন্তু তার চলে আসতো। তাই শুদ্ধ আর আঞ্চলিক মিশে এমনই অদ্ভুত শোনাতো যে হাসি থামিয়ে রাখতে পারতাম না।

যদি কখনো তাকে সম্পূর্ণ আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলতে বলতাম তাহলে তার একটিই উত্তর, সে জন্য কি শুদ্ধ কথা বলা শিখবো না?

উত্তর শুনে আমাদের আর কি বলার আছে। কিন্তু বন্ধুটির দয়া-মায়া ছিলো বেশ। যদি কখনো পড়াশুনার সাহায্য চাইতাম তাহলে সে যত ব্যস্তই থাকুক না কেন আমাদের সাহায্য করতে কৃপণতা করতো না। আমরা কোন সমস্যায় পড়লে আগে বন্ধুর একটু প্রশংসা করতাম। তাহলেই কাজ হয়ে যেতো।

প্রশংসা বাক্য শুনানোর পর যদি কখনো বলতাম, দোস্ত চলো গুরুত্বপূর্ণ কাজে এক জায়গায় যেতে হবে। বন্ধুটি তার শত কাজ বাদ দিয়ে হলেও আমাদের সাথে যেতো। মজার বিষয় হচ্ছে আমার সাথে বন্ধুর প্রায়ই ঝগড়া বাঁধতো। সকালে ঝগড়া করলাম তো বিকালে আবার মিলে যেতাম। বন্ধুটি আমাদের প্রায়ই শুধু নীতিবাক্য শোনাত। এটা করা যাবে না। ওটা করা যাবে না। তার এই ধরনের কথাবার্তার জন্য তাকে কিভাবে জব্দ করা যায় সেই পথ খুঁজছিলাম।

পথ খুঁজে পাওয়ার আগেই আমাদের জুনিয়র ভাইয়েরা বন্ধুকে জব্দ করে বসলো। একদিন জানতে পারলাম বন্ধু এক মেয়ের প্রেমে পড়েছে। কিন্তু বন্ধু আমাদের কারো সাথে প্রেমে পড়ার কথা বলেনি। শুধু বলেছে জুনিয়রদের কাছে। জুনিয়র কয়েকজন ইচড়েপাকা বন্ধুকে একটি ভালবাসার চিঠি দিয়ে বললো যে, এটা তার প্রেমিকা দিয়েছে। আর বিশ্বাস করারই কথা। কারণ জুনিয়র কয়েকজনের সাথে মেয়েটির ভালো সম্পর্ক ছিলো।

চিঠি পেয়ে বন্ধু সেকি খুশি! কয়েকদিন পর দেখি বন্ধু আমাদের ছেড়ে জুনিয়রদের সাথে সময় কাঁটায়।

আবার আরেকদিন বন্ধুকে তার প্রেমিকার সাথে মোবাইলে কথা বলতে দেখি। কিন্তু কয়েকদিন পর জানতে পারলাম, ভালবাসার চিঠি আর মোবাইলে কথা বলা সবই ভুয়া। জুনিয়র কয়েকজন নিজেরাই চিঠি লিখে বন্ধুকে দিয়েছে। আর বন্ধুকে মোবাইলে কথা বলায় তাদেরই পরিচিত এক মেয়ের সাথে। আমরা কত করে বন্ধুকে বুঝালাম। কিন্তু কে শোনে কার কথা।

পড়াশুনা শেষ হওয়ার পর অনেকদিন যাবৎ বন্ধুর সাথে যোগাযোগ নেই। সবাই যার যার মতো চাকুরীতে প্রবেশ করেছি। একদিন শুনি বন্ধুর বিয়ে। কোথায় বিয়ে করতে যাচ্ছে জানি না। এনগেজমেন্ট হয়ে গিয়েছে শুনলাম। তাহলে বিয়ে বন্ধু করছেই। একদিন সময় করে বন্ধুকে মোবাইল করলাম। কয়েকবার চেষ্টার পর লাইনে পেলাম। বন্ধুর কথা শুনে বুঝতে পারলাম বেশ আনন্দেই দিন কাটছে। কথায় কথায় বললো, তোর বৌদিও পাশে আছে; কথা বলবি?

অবাক হলাম! বন্ধু আবার কবে বিয়ে করলো। শুনেছি বিয়ের কথাবার্তা চলছে।

বন্ধুই আমার ভুল ভাঙ্গালো, বললো, ভাবিস না যে বিয়ে করেছি।

বুঝতে পারলাম, বিয়ের আগে ডেটিংএ বের হয়েছে।

বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করলাম, বিয়ের আগে প্রেম কেমন চলছে?

প্রেমটা এখনো ভাল বুঝে উঠতে পারছি না রে!

এক সময় না এত করে তোমাকে বলতাম, প্রেম করো প্রেম করো। আমাদের কথাতো গ্রাহ্যই করোনি।

বন্ধু বললো, ভুলই হয়েছে; তোদের কথা যদি সেই সময়ে শুনতাম তাহলে আমাকে আজ আর এই বিপদে পড়তে হয় না। সেদিন বন্ধুর হবু স্ত্রীর সাথে কথা বললাম। হবু স্ত্রী কথার এক ফাঁকে বললো, আপনার বন্ধু তো প্রেমে বেশ অনভিজ্ঞ।

শুনে মনে মনে হাসলাম। বন্ধুর হবু স্ত্রীকে মিথ্যা বললাম, কে বলেছে অনভিজ্ঞ? বিয়ের আগে ওতো বহু প্রেম করেছে।

কিন্তু এই কয়েকদিন আপনার বন্ধুর সাথে সময় কাঁটিয়ে তো বুঝলাম প্রেমে ও অকাল অপরিপক্ক!

সেদিন আর বেশী কথা হয়নি। বন্ধুর বিয়ে। ওরা সুখি হোক। বন্ধু আমার দিনে দিনে অকাল অপরিপক্ক থেকে পরিপক্ক হয়ে উঠুক॥

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
প্রতিবেশী'র বার্ষিক চাঁদা পরিশোধ করেছেন কি?

বন্ধুত্বঃ জীবনের চরম বাস্তবতা

দুলেন্দ্র ড্যানিয়েল গমেজ

"রোদের মধ্যে রোদ হয়ে যাই, জলের মধ্যে জল
বুকের মধ্যে বন্ধু একটি নিঃশূন্য অঞ্চল"

মানব জীবনে সম্পর্ক ব্যাপারটা খুবই সুন্দর এবং সেই সঙ্গে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। জীবনে বেঁচে থাকতে হলে নিঃশ্বাস নেওয়াটা যেমন জরুরী তেমনি সুন্দর সম্পর্কে বাস করাও অত্যন্ত জরুরী। মানবজীবনে তেমনি এক অন্যতম মধুর, সুন্দর ও শ্রেষ্ঠ সম্পর্কের নাম হচ্ছে 'বন্ধুত্ব'। পৃথিবীতে মায়ের সাথে সন্তানের সম্পর্কের পরেই "বন্ধুত্ব" নামক সম্পর্কটি আমার-আপনার জীবনে স্থান দখল করে নিয়েছে। কারণ বন্ধুত্বের মানদণ্ড বা ভিত্তি হচ্ছে মন ও আত্মা। তাই মানব জীবনে বন্ধুত্ব হয়ে উঠেছে এক অপূর্বময় ও পবিত্রতম সম্পর্ক। বন্ধু হচ্ছে সেই ব্যক্তি যাকে নির্দ্বিধায় মনের সব কথা বলা যায়, যার সঙ্গে নিজের কষ্ট ভাগ করা যায়, যে পাশে থাকলে পৃথিবী জয় করার সাহস পাওয়া যায়। প্রকৃত বন্ধুত্ব হলো ঈশ্বরের কাছ থেকে পাওয়া এক অমূল্য উপহার। সর্বকালের শ্রেষ্ঠ উপহার। তাই তো বলতে চাই,

"বন্ধু মানে একই সুরে গান, বন্ধু মানে অকারণে মান-অভিমান।

বন্ধু মানে হতাশার সাগরে একটু খানি আশা, বন্ধু মানে এক বুক ভালবাসা"

বন্ধুত্ব মানে জীবনের চরম বাস্তবতায় একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। যে অধ্যায়ে রয়েছে, প্রেম-ভালবাসা, মায়া-মমতা, মান-অভিমান, বিশ্বাস-আশা ও পরম নির্ভরশীলতা। আত্মার বন্ধন হতে এই বন্ধুত্বের সূচনা। বন্ধু হচ্ছে আত্মার আত্মীয়। তাই তো বলা হয়ে থাকে বন্ধুত্ব হলো একটি পবিত্র সম্পর্ক, যেখানে দুটি শরীরে বিদ্যমান একটি আত্মা এবং পরস্পরের মাঝে নিজের সত্ত্বকে খুঁজে পায়। এই বন্ধুত্বের কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঐশ গুণ রয়েছে যার কারণে একজন বন্ধুকে প্রকৃত বন্ধু বলে স্বীকৃতি দেওয়া যায়। বিশ্বস্ততা হলো প্রকৃত বন্ধুত্বের চিহ্ন। পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস বলেছেন, "বন্ধুত্ব হলো জীবনের নানা উপহারগুলোর একটি এবং ঈশ্বরের কাছ থেকে পাওয়া একটি অনুগ্রহ। বন্ধুত্বের মধ্যদিয়ে প্রভু আমাদের পরিশুদ্ধ করেন এবং পরিপূর্ণতার দিকে নিয়ে যায়।" তাই সবসময় এই বন্ধুত্বের যত্ন ও লালন করতে হয়। বন্ধুত্ব কোন নিয়ম ধরে তৈরি হয়না। কিন্তু যখন কারও সাথে বন্ধুত্ব তৈরি হয় তখন তা টিকিয়ে রাখার জন্য সাধনা করতে হয়। কারণ বন্ধুত্বের পরিপক্কতা জীবনকে স্বার্থক করে তোলে। তাই দার্শনিক সক্রেটিস বলেছেন, "বন্ধুত্ব গড়তে ধীরগতির হও কিন্তু বন্ধুত্ব হয়ে গেলে তা প্রতিনিয়ত পরিচর্চা কর।"

বন্ধু এমন একটা রংধনু যেখানে সুখ-দুঃখ, ব্যথা-বেদনা সহভাগিতার মাধ্যমে দুটি হৃদয়ের একটি রঙিন সেতুবন্ধন তৈরি হয়। তাই বন্ধুত্বের সম্পর্ক হচ্ছে একটি মধুর সম্পর্ক। এর উৎস হলো পবিত্র হৃদয়, যে হৃদয় ভালবাসায় পরিপূর্ণ। প্রকৃত বন্ধুত্বের অকৃত্রিম ভালবাসাই বন্ধুত্বকে জীবন দেয় ও বাঁচিয়ে রাখে। তাই তো যিশু বলেছেন, "বন্ধুর জন্য প্রাণ দেওয়ার চেয়ে বড় ভালবাসা আর কিছুই নেই *(যোহন ১৫:১৩)*।" এজন্য বন্ধু কখনো পুরোনো হয় না, বন্ধু সর্বদাই নতুন। যে বন্ধু সুখে-দুঃখে সহমর্মিতা প্রকাশ করে, বিপদে সহায়তা করে, দ্বিধাগ্রস্ত অবস্থায় সুপরামর্শ দেয়, ভুল পদক্ষেপ থেকে বিরত থাকতে সহায়তা করে, বন্ধুত্ব নষ্টের ভয়ে ভীত না হয়ে প্রয়োজনের মুহূর্তে সত্য উচ্চারণ করে আলোর পথ দেখায় সেই প্রকৃত বন্ধু। একজন প্রকৃত বন্ধু পাওয়া ঈশ্বরের বিশেষ দান ও অনুগ্রহ। তাই তো পবিত্র বাইবেলে বেন-সিরা গ্রন্থ আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়, "বিশ্বস্ত বন্ধু সে তো প্রবল আশ্রয়, তেমন বন্ধু যে পায় সে তো মহাধন পায়। বিশ্বস্ত বন্ধু সে তো অমূল্য সম্পদ, তার যোগ্যতা পরিমাপের অতীত *(বেন-সিরা ৬:১৪-১৫)*।"

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজে বসবাস করতে গেলে আমাদের কারো না কারো সাহায্যের প্রয়োজন হয়। কারণ আমরা একা পথ চলতে পারি না আর এই সাহায্যের তাগিদেই একজন বন্ধুর প্রয়োজন। মূলত বন্ধু হল সেই ব্যক্তি, যার সাথে সকল আবেগ, অনুভূতি, ইচ্ছা, স্বপ্ন ও একান্ত অভিজ্ঞতা চোখ বন্ধ করে নির্দ্বিধায় সহভাগিতা করা যায়। মূলত বন্ধুত্ব তৈরি হয় না বরং বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। আর এই বন্ধুত্বের সম্পর্ক সারা জীবন স্থায়ী হয়ে থাকে। তাই আমরা বন্ধুত্ব নিয়ে কম-বেশি, ভাল-মন্দ অভিজ্ঞতা করে থাকি। কারণ পৃথিবীতে এমন কোনো ব্যক্তি নেই যার জীবনে কোন বন্ধু ছিল না। অনেকে খারাপ বন্ধুর সংস্পর্শে এসে তিক্ত অভিজ্ঞতা অর্জন করে; আবার অনেকেই ভাল বন্ধুর সহযোগিতায় প্রকৃত মানুষও হয়ে ওঠে।

বর্তমানে মিডিয়ার বদৌলতে ও মেকি ভালোবাসার যুগে বন্ধুর সংখ্যা তরতর করে বাড়ছে, সেখানে কে খাঁটি আর কে নকল বন্ধু তা বুঝা বড় দায়। মূলত কৃত্রিম বা নকল বন্ধুগুলো স্বর্থের কারণে বন্ধুত্ব করে। জীবন অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি যে, কিছু কিছু বন্ধু আমাদের জীবনে অতিথিপাখি হয়ে আসে। তারা জীবনের ক্ষণস্থায়ী বন্ধু হয়ে বাসা বাঁধে। হঠাৎ করে জীবন-সমুদ্রে ঝড় তুলে জীবনকে ওলট-পালট করে দেয়। তারা উড়ে এসে জুড়ে বসে বন্ধুত্বের পবিত্রতা নষ্ট করে দেয়। স্বার্থের কারণে বন্ধুত্ব করে বলে এদেরকে সু-সময়ের বন্ধু বলে। তারা প্রতিনিয়তই বন্ধুত্বের ভান করে প্রকৃত বন্ধুত্বের মাধুর্যতাকে কলুষিত করছে। তাদের মত বন্ধুদের সংস্পর্শে এসে অনেকেই জীবনে ধ্বংসের পথে পা বাড়ায় আবার অনেকেই চিরতরে হারিয়ে যায়। তাই বন্ধু বাছাইয়ের ক্ষেত্রে আমাদের আবেগিক না হয়ে বরং পরিপক্কতার সাথে সেটা বিবেচনা করতে হবে।

বন্ধুত্বের অভিজ্ঞতা আমাদের শেখায় অন্যদের প্রতি উন্মুক্ত হতে, তাদের উপলব্ধি করতে ও যত্নশীল হতে এবং আমাদের জীবন অন্যদের সাথে সহভাগিতা করতে। মূলত বন্ধু হল সেই যার সাথে সকল অনুভূতি সহভাগিতা করা যায়। বন্ধু মানেই তো হাতে হাত রেখে একসাথে পথ চলা, প্রাণ খোলা হাসি, আড্ডা, একটু অভিমান করা। সত্যিই অক্সিজেন ছাড়া যেমন এক মুহূর্তও বাঁচা যায় না তেমনি বন্ধু ছাড়াও এক মুহূর্ত পথ চলা অতি দুষ্কর। তাই বন্ধুত্বের মাঝে যেন পরস্পরের প্রতি সম্মান ও আস্থা থাকে। কারণ তা এই সম্পর্কটিকে মসৃণ ও দীর্ঘস্থায়ী করে। অন্যদিকে গ্রহণীয় মনোভাবটিও এই সম্পর্কের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ প্রকৃত বন্ধু তার বন্ধু যে রকম তাকে ঠিক সে রকম ভাবেই গ্রহণ ও সাহায্য করে।

বন্ধু ছায়াদানকারী বৃক্ষের মত, সে জীবনের সকল পরিস্থিতিতে ছায়ার মত পাশে থাকে। তাই জীবনে টাকা-পয়সা, ধন-সম্পদের চেয়েও একজন সত্যিকারের বন্ধুর প্রয়োজন অনেক বেশি। চালক ছাড়া গাড়ি, ব্যাটারি ছাড়া যেমন ঘড়ি চলতে পারে না তদ্রুপ বন্ধু ছাড়া কোন স্বাভাবিক বা সুস্থ মানুষ চলতে পারে না। কথায় বলে দুঃখ সহভাগিতা করলে অর্ধেক হয় আর আনন্দ সহভাগিতা করলে দ্বিগুণ হয়। সত্যিকারের বন্ধুর সাথে সেই আনন্দ সহভাগিতা করা যায়। কারণ বন্ধু মানেই নির্ভরতা, যাকে নিশ্চিতভাবে মনের সব কথা বলা যায়। একমাত্র প্রকৃত বন্ধুর ছায়ায় জীবন হয় আলোকিত ও পুলকিত। পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস বলেন, "বন্ধুত্ব ভেসে যাওয়া বা ক্ষণস্থায়ী কোন সম্পর্ক না বরং বন্ধুত্ব হলো এমন কিছু যা স্থির, দৃঢ় ও বিশ্বস্ত এবং সময়ের প্রবাহে যা আরো পরিপক্ক হয়।"

তাই আমরা প্রত্যেকে যেন প্রকৃত বন্ধু হয়ে ওঠার চেষ্টা করি যাতে অন্য আরেক জন ভাল ও অকৃত্রিম বন্ধু পেতে পারে। তাই আজ বিশ্ব বন্ধু দিবসে আমার আপনার সকল বন্ধুদের প্রতি রইল অসংখ্য ভালোবাসা ও শুভকামনা ॥

কৃতজ্ঞতা স্বীকারঃ

১. পবিত্র বাইবেল

২. রমনা দর্পণ

৩. সাপ্তাহিক প্রতিবেশী (সংখ্যা-২৭; ২০১৯,২০২০,২০২১)॥

নিয়মিত কলাম

সেদিনের গল্পকথা

হিউবার্ট অরুণ রোজারিও

সামাজিক ন্যায় বিচার

প্রতি বছরই ২০ ফেব্রুয়ারিতে "বিশ্ব সামাজিক ন্যায়বিচার দিবস" ঘটা করে পালিত হয়। এবার সামাজিক ন্যায়বিচারের আলোকে বিশ্বে ধনী-দরিদ্রের বেড়ে যাওয়া প্রকটভাবে আলোচিত হয়েছে। করোনাকালে ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য অনেক বেড়ে গেছে কারণ বহু মানুষ বেকার হয়েছে অনেক কর্মসংস্থান বন্ধ হয়েছে এবং বেকারত্ব ভয়াবহভাবে ছেয়ে পড়েছে। বেকারত্বের অভিশাপে ন্যায় বিচার কতটুকু পালিত হচ্ছে তা দেখা দরকার। অনেক দেশে বিশেষত দক্ষিণ এশিয়ায় এক নতুন বৈষম্যের সৃষ্টি হয়েছে।

শহরে কর্মশক্তির প্রায় ৭০ শতাংশ লোকের স্থায়ী কোন কর্মসংস্থান নাই। রাষ্ট্র এই সকল প্রান্তিক জনগণকে কোন অর্থনৈতিক অধিকার স্থায়ী করতে পারছে না। অনেক উন্নত দেশে সরকার প্রণোদনা দিয়ে কিছুটা সামাল দেয়। তবে উন্নয়নশীল দেশের বেকার জনসংখ্যা হতাশায় দিন কাটাচ্ছে। আমাদের দেশে সরকার কিছু প্রণোদনা দিতে চেষ্টা করেছে, তবে সে সাহায্য পাচ্ছে বড় বড় শিল্প মালিকগণ। সরকার চেষ্টা করছে যেন মিল-কারখানাগুলো চালু থাকে। এ সেক্টরের উপরই বেশি শ্রমিক নির্ভর করে। মাঝারি ও ছোট ছোট শিল্পের জন্য প্রণোদনা খুবই সামান্য।

আমাদের মত উন্নয়নশীল দেশগুলোতে সরকার সরাসরি অর্থ দেয়ার কোন পদক্ষেপ নিচ্ছেন না কারণ দেশে দরিদ্রদের ও নব্য দরিদ্রদের কোন জরিপ তালিকা নাই, এবং কোন কালে তা করা হয় নাই। অবস্থা খুব গুরুত্বপূর্ণ হলে, বিভিন্ন স্থানে যেখানে বেকারত্বের সংখ্যা বেশি, সেখানে অস্থায়ীভাবে কিছু লঙ্গরখানা খোলা হয়। এলাকা ভিত্তিক দরিদ্রদের কোন জরিপ নাই, তাই সরকারী অনুদান দেবার কোন রাস্তা নাই।

নোবেল লরেট অমর্ত্য সেন শ্রমিকদের মানুষ হিসেবে দেখতেন। তিনি বলেন যে সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতার ভিন্নতায় সামাজিক ন্যায়বিচারে তারতম্য ঘটে। অমর্ত সেন উদাহরণ হিসাবে দেখান যে:

যে তিনটি ছেলে আসগর, করিম ও শ্যামল সকলেই একটা সুন্দর বাঁশী পেতে আগ্রহী। তখন সে বন্টনে প্রশ্ন উঠছে: আসগর খুব ভাল বাঁশী বাজায়। এটা করিম ও শ্যামল উভয়েই জানে। যেহেতু বাঁশীটা সরকার থেকে এসেছে তাই বাঁশীটা তারই প্রাপ্য। করিম খুব দরিদ্র পরিবার থেকে এসেছে। সে সরকারের কাছ থেকে কোন দিন কোন সাহায্য পায় নাই। তাই করিমের বাঁশীটা পাওয়ার আকুতি রয়েছে জোরালোভাবে। শ্যামলের দাবি বাঁশী বানানো তার এবং তার পিতৃপুরুষের পেশা, সে এ বাঁশীটাও বানিয়েছে। এর কাছ থেকেই রাষ্ট্র বাঁশীটি ক্রোক করেছে, তাই এটা তারই প্রাপ্য। এখন কার বাঁশীটা পাওয়া উচিৎ। সামাজিক ন্যায়ের দৃষ্টিতে অনেক ধরনের উত্তর পাওয়া যাবে। যিনি দক্ষতাকে মূলভিত্তি বলে মনে করেন, তিনি আসগরকেই বাঁশী দেয়ার পক্ষে থাকবেন। যারা হিতবাদী দর্শনের লোক। যাদের মধ্যে সামাজিক ডেমোক্রেসির প্রভাব রয়েছে। যারা উদারনৈতিক দর্শনের প্রবক্তা, তারা বলবেন, যেহেতু করিমের বাঁশী নেই। সেহেতু তাকেই বাঁশীটি দেয়া হোক। এটা সাম্যবাদ এবং ন্যায় সঙ্গত। তবে তা সমাজতান্ত্রিক নয়। ন্যায্যতার জন্য শ্যামলের শ্রমদান করে মেধা দিয়ে জিনিসটা বানিয়েছে। তাকে না দিয়ে তা কেড়ে নেয়া হচ্ছে, এটাতো শ্যামলের জিনিস। বাঁশীটা শ্যামলকে দিলে দেশের প্রবৃদ্ধি এগিয়ে যাবে। তবে সামাজিক ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠিত হবে না।

করোনাকালে বৈশ্বিক নানা তৎপরতায় সামাজিক ন্যায় বিচার খুব একটা পালিত হচ্ছেনা। দেশের বিরাট সংখ্যক বেকারদের মৌলিক অর্থনৈতিক অধিকার বেশি দিতে পারছে না। উদারপন্থীগণ বলেন, দেশের বৈষম্য ঘুচাতে, আমাদের সমাজতান্ত্রিক বন্টন পদ্ধতিকে বেছে নিতে হবে। আমাদের সংবিধানে একটি সুস্থ সমাজতন্ত্র সেটা বৈষম্যহীন দেশ গড়ার হাতিয়ার হিসেবে রাখা হয়েছে। সেটা বাস্তবায়ন হয় নাই।

বিশিষ্ট চিন্তাবিদ ও অর্থনীতিবিদ ড. আকবর আলি খান বলেন যে, স্বাধীনতার ৫০ বছর পর বাংলাদেশের অবস্থা এখন বিভিন্ন সূচকে সাফল্য দেখিয়েছে। তবে বৈষম্য কমাতে হবে। গণতন্ত্রকেও সুদৃঢ় করতে হবে। দেশে কারিগরি ও প্রযুক্তির উন্নতির কারণে মানুষের ক্ষমতা অনেক বেড়েছে। আমরা এগিয়ে যাচ্ছি তবে সকল ক্ষেত্রে সমানভাবে এগোতে পারছি না। সমাজতন্ত্রের মূলকথা ছিল বৈষম্য কমানো। বাংলাদেশে বৈষম্য কমে নাই। কিছুটা বেড়েছে। এভাবে বৈষম্য বাড়তে থাকলে সামাজিক ন্যায্যতা দেশ থেকে খর্ব হবে।

একাত্তরে বাংলাদেশে যে পরিমাণ খাদ্য উৎপাদন করেছে তার থেকে ১০ গুণ বেশি হয়েছে। তবে জনসংখ্যাও বেড়েছে। মানবসম্পদ উন্নয়ন সূচকে আমরা কখনও পিছিয়ে যাই। ক্ষুধা সূচকে এখনো আমরা ৭০ থেকে ৮০টি দেশের পেছনে রয়েছি। আমরা ক্ষুধা সূচক থেকে বেরিয়ে আসতে পারছিনা।

বাংলাদেশের দুই প্রধান চালিকাশক্তি, তৈরি পোশাক শিল্প ও প্রবাসী আয়। পোশাক শিল্পে বাংলাদেশ এখন বিশ্বের মধ্যে দ্বিতীয় স্থানে। হয়তো প্রথম স্থানে যেতে পারব। দেশের প্রবাসী আয় আমাদের অর্থনীতিকে শক্ত করে তবে আমাদের অদক্ষ শ্রমিকগণ অনেক স্বল্প বেতনে কাজ করে এবং অনেক দেশের শ্রমিক এত কম বেতনে কাজ করতে চায় না। শিক্ষা ক্ষেত্রে মোট লোক সংখ্যার ১০ শতাংশ। তাও অনেকে বাইরের দেশের আকর্ষণে বিদেশ চলে যাচ্ছে। আমাদের চীনকে অনুসরণ করতে হবে। চীন থেকে শিক্ষার্থীরা বিদেশ যায় না।

আমাদের দেশের শাসন পরিচালনায় প্রধান সমস্যা অযোগ্যতা এবং দুর্নীতি। এ ক্ষেত্রে ডিজিটালাইজেশন সহায়তা করেছে এবং জনগণের চাহিদা পূরণ করছে। যেমন অনলাইনে টেন্ডার বাছাই অনেক দুর্নীতি হ্রাস করেছে।

জনগণের কল্যাণে শাসন, তাদের চাহিদা পূরণ, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও সর্বোপরি আইনের শাসন। বাংলাদেশকে উন্নত দেশ হিসেবে আখ্যায়িত করবে। দেশের স্বাধীনতা যখন কায়েম করেছি, এখন দেশকে সুন্দর করতে আমাদের অনেক ত্যাগস্বীকার করতে হবে। আগে আমরা পরাধীন ছিলাম, অনেক কিছু করতে পারতাম না এখন কঠিনভাবে কাজ করে আমাদের জনগণের স্বপ্নের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করে এগিয়ে যেতে পারি॥

Wanted

Omni Companies will employ a diploma Civil Engineer.

Age: bellow 30 Years.

Educational Qualification: Diploma in Civil Engineering.

Experience: 3 to 5 years.

W**orkplace:** Khulna/Gazipur.

Send your CV

Omni Companies
E-mail: marketing1@enemomni.com

বিজ্ঞ/২২১/২২

রাতের ট্রেন

জাগ্রতী স্মীতা কোড়াইয়া

দু'বছর আগের কথা। বাবার সাথে সিলেটে যাব। রাত ১২টার ট্রেনে টিকিট কাটা হলো। আমি আর বাবা ১১টায় রেল স্টেশনে এসে বসে আছি। প্লাটফর্ম একেবারেই ফাঁকা। চারিদিকে শুনসান নীরবতা। প্লাটফর্মের আলোয় চারপাশ আলোকিত হয়ে আছে। আমরা ট্রেন আসার জন্য অপেক্ষা করলাম। ১২টা বাজার সাথে সাথেই বিকট শব্দে ট্রেন এসে প্লাটফর্মে দাঁড়ালো। মানুষের মধ্যে নামার তোড়জোড় তেমন চোখে পড়লো না। আমরা জনা বিশেক ট্রেনে উঠলাম।

ট্রেন আবারো দৌড়াতে শুরু করে। ধীরে ধীরে প্লাটফর্মের আলোগুলো পিছনে পড়ে যায়। ট্রেনের বগিতে অন্ধকার নেমে আসে। জানালা দিয়ে দূরে আবছা গাছগুলোকে দৌড়াতে দেখি। আমার কেন জানি মনে হতে থাকে এই অন্ধকার পৃথিবীতে আমি একলা শুধু দৌড়াচ্ছি।

কিছুক্ষণের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ি। তার আগে বাবাকে লক্ষ্য করলাম বাবা নাক ডেকে ঘুমাচ্ছে।

হঠাৎ শব্দে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। দেখি আমার পাশে কেউ একজন বসে আছে। আমি দেখে চমকে উঠলাম। সাদা কাপড় পড়া একজন মহিলা ঘোমটা দিয়ে বসে আছে। তখন আমার গায়ের লোমগুলো খাঁড়া হয়ে ওঠে। বাবাকে খুঁজতে থাকি। কোথাও বাবাকে দেখা যাচ্ছে না। পাশের সিটগুলোও ফাঁকা। ভয় পেতে থাকি। মহিলার মুখ দেখা যাচ্ছে না।

আমি হঠাৎ চিৎকার দিয়ে উঠলাম। বাবা জেগে ওঠে বললো, কি হলো রতন?

আমি ভয়ে ভয়ে বললাম, বাবা আমার ঘুম ভাঙ্গার পর দেখি আমার পাশে সাদা কাপড় পড়া একজন মহিলা বসে আছে। আমি দেখে খুব ভয় পেয়েছি।

বাবা বললো, ও কিছু না, হয়তো তোমার মনের ভুল। এখন তুমি ঘুমিয়ে পড়।

এরপর ঘুমানোর চেষ্টা করলাম। কিন্তু কিছুতেই ঘুম আসছিলো না। বার বার সাদা কাপড় পড়া ঐ মহিলার ছবি ভেসে উঠছিলো।

এরপর কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি বুঝতেই পারলাম না। হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে দেখি সকাল হয়ে গিয়েছে। ট্রেন সিলেটের কাছাকাছি চলে এসেছে। কালো কালো পাহাড়গুলো দেখা যাচ্ছে। সকালের সূর্যের আলো পাহাড়ের গায়ে পড়ে অন্যরকম পরিবেশের সৃষ্টি করেছে।

সে বার সিলেটে বিশ দিন ছিলাম। একদিনের জন্যেও রাতে ট্রেনে দেখা সাদা কাপড় পড়া মহিলার কথা ভুলতে পারিনি।

এখনো যখন ঐ মহিলার কথা মনে পড়ে ভয়ে গায়ের লোম দাঁড়িয়ে যায়॥

বন্ধুত্বের অভিব্যক্তি

চাম্বুগং বর্ষা

বন্ধু এ যেন মানবীয় সম্পর্কের এক মহিমান্বিত প্রকাশ,
দুটি হৃদয়ের সিন্ধ মিলনে হয় এর বিকাশ ।
যোগাযোগ হয়ে ওঠে উন্মুক্ত, বিশ্বাসযোগ্য,
চিরন্তন আর অটল,
বন্ধুত্বের এই বৃদ্ধলাভ যেন জীবনের ছায়াতল।।
নবীন জীবন, নব প্রেরণা এর সাথে থাকে বহুদূর পথ,
বন্ধুত্বের ভালবাসা, পাশে থাকার প্রত্যাশা,
বাড়িয়ে দেয় উদ্যমতার শপথ।
তাই তো বলে "বন্ধুত্ব কাছে টানে , স্বার্থ ঠেলে দূরে"
বন্ধুর কর্ম, ক্ষুদ্রলীলা ও আন্দদের মেলা
জেগে ওঠে চুপটি করে ।।
বন্ধু অভিন্ন , অনন্য, চিত্ত সেখানে ভয়শূণ্য,
জ্ঞান-গর্ব, যশ-খ্যাতি- সম্মানেরও হয় না কোন বিপন্ন।
কত সুখে-দুঃখে, আলোক আধারে বন্ধু দেয় হাত বাড়ায়ে,
স্থির রেখার বন্ধনে, নিরব ক্রন্দনেও জীবনটা দেয় বিলিয়ে।।
এই তো বন্ধুত্বের অভিজ্ঞতা , জীবনের স্বার্থকতা,
অকৃত্রিম ভালবাসা, উৎসাহ, আস্থা,
সহযোগিতায় এর বাস্তবতা।
নিঃসন্দেহে মহত্তর বন্ধুর কাছে বন্ধুর ক্ষুদ্র হৃদয়ের স্মরণশক্তি,
বন্ধুত্বের এ সুবিবেচনা, উন্নত ভাবনায়,
সত্যিকারের বন্ধুত্বের অভিব্যক্তি।।

আর্চবিশপ মজেস এম কস্তা সিএসসি এর ২য় মৃত্যুবার্ষিকী উদ্‌যাপন

ফ্লাভিয়ান ডি'কস্তা ▯ গত ১৩ জুলাই ২০২২ খ্রিস্টাব্দ চট্টগ্রাম মহাধর্মপ্রদেশের পবিত্র জপমালা রাণী গীর্জায় শ্রদ্ধেয় আর্চবিশপ মজেস এম কস্তা সিএসসি'র ২য় মৃত্যুবার্ষিকী উদ্‌যাপন করা হয়। তিনি ১৭ নভেম্বর ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশে ধর্মপাল থাকা অবস্থায় ১৩ জুলাই ২০২০ খ্রিস্টাব্দে ঈশ্বরের ডাকে সাড়া দিয়ে এ পৃথিবী ত্যাগ করেন। ২য় মৃত্যুবার্ষিকী স্মরণে বিকাল ৫:৩০ মিনিটে পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন আর্চবিশপ লরেন্স সুব্রত হাওলাদার সিএসসি। খ্রিস্টযাগের পর আর্চবিশপের সমাধিতে শ্রদ্ধা ও ভক্তি নিবেদন করা হয়।

ক্যাথেড্রাল ধর্মপল্লীর সহকারী পালপুরোহিত সজল কস্তা বলেন, আর্চবিশপ মজেস এম কস্তা সিএসসি হলো আমার জীবনের অনুপ্রেরণাদায়ী ব্যক্তিত্ব। সেমিনারীর গঠন জীবনে তিনি ছিলেন আমার আদর্শ। খ্রিস্টভক্তদের পক্ষ বাবরা গোমেজ বলেন- আর্চবিশপ মজেস এম কস্তা সিএসসি ছিলেন আদিবাসী ও দরিদ্র মানুষের শুভাকাঙ্ক্ষী। তিনি ছিলেন দিনাজপুর ও পার্বত্য চট্টগ্রাম উপজাতি সম্প্রদায়ের পক্ষে। তিনি সর্বদা তাদের মঙ্গল কামনায় পাশে দাঁড়াতেন। এ স্মরণিয় দিনে চট্টগ্রাম মহাধর্মপ্রদেশের প্রতিটি ধর্মপল্লীতে আর্চবিশপ মজেস এম কস্তা সিএসসি এর আত্মার চিরশান্তি কামনায় প্রার্থনা করা হয়॥

পাগাড় ধর্মপল্লীতে জাকজমকের সাথে বিশ্ব দাদা-দাদী, নানা-নানী ও প্রবীণ দিবস উদ্‌যাপন

ফাদার জ্যোতি এফ কস্তা ▯ পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস ২০২১ খ্রিস্টাব্দে কুমারী মারীয়ার পিতা-মাতা অর্থাৎ যিশুর নানা-নানীর পর্বদিন ২৬ জুলাইকে কেন্দ্র করে বিশ্ব দাদা-দাদী, নানা-নানী ও প্রবীণ দিবস উদ্‌যাপন করতে ঘোষণা দিয়েছেন। এই পর্বদিন বিশ্ব মণ্ডলীতে প্রতিবছরই পালন করা হবে ২৬ জুলাই এর নিকটতম রবিবার যাতে অধিক সংখ্যক খ্রিস্টভক্ত পবিত্র খ্রিস্টযাগে যোগদান করতে পারেন। এই বছর ২৪ জুলাই ছিল বিশ্ব দাদা-দাদী, নানা-নানী ও প্রবীণ দিবস। ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের অন্তর্গত প্রভু যিশুর গির্জা, পাগাড় ধর্মপল্লীতে দিবসটি অতিব গুরুত্বসহকারে এবং জাঁকজমকের সাথে উদ্‌যাপন করা হয় ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের সামাজিক যোগাযোগ কমিশনের সার্বিক সহযোগিতায়। বিকাল ৪:৩০ মিনিটে পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করা হয়। খ্রিস্টযাগের প্রারম্ভে পালপুরোহিত ফাদার জ্যোতি এফ কস্তা দিনের তাৎপর্য এবং এই দিবস পালনের পটভূমি সকলের নিকট তুলে ধরেন। তিনি উপস্থিত সকল দাদা-দাদী, নানা-নানী এবং প্রবীণ বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি আন্তরিক ভক্তি-শ্রদ্ধা, ভালবাসা এবং সম্মান প্রকাশপূর্বক তাদেরকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন, দাদা-দাদী, নানা-নানী ব্যতিত আমাদের জীবন চিন্তা করতে পারিনা কেননা তারাই আমাদের মা-বাবা, পিতা-মাতা, আমাদের গুরুজন। তাদের প্রতি প্রতিদিনকার জীবনে পরিবারে পরিবারে আরো যত্নশীল হতে হবে। তাদেরকে ভালবাসাপূর্ণ সেবাদান করতে হবে। তাদের সাথে দূরত্ব নয় বরং নৈকট্য লাভে তাদের জীবনের গল্প শুনতে হবে। খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করেন রয়োজ্যেষ্ঠ যাজক ফাদার ডমিনিক সেন্টু রোজারিও। সাথে ছিলেন ফাদার বুলবুল এ রিবেরু, ফাদার বিমল গমেজ, ফাদার জনি হিউবার্ট গমেজ এবং পালপুরোহিত ফাদার জ্যোতি এফ কস্তা। খ্রিস্টযাগে সহভাগিতা করেন ফাদার বুলবুল এ রিবেরু। তিনি দাদা-দাদী, নানা-নানী ও প্রবীণদের প্রতি প্রাত্যহিক জীবনে আরো সংবেদনশীল, যত্নবান ও আন্তরিক হতে অনুপ্রেরণা দান করেন। তাদের চাহিদা, প্রয়োজন বুঝে সেভাবে পরিবারে ও সমাজে তাদেরকে সম্মান করা, যথাযথ মর্যাদা দান করা ও ভালবাসা এবং ভক্তি-শ্রদ্ধা করার মাধ্যমে ঈশ্বরের আশীর্বাদ লাভ করা যায়। একজন প্রবীণ ড. ইসোদর গমেজ তার জীবনে প্রবীণদের তিনি কী ভাবে দেখেন, ভক্তি-শ্রদ্ধা করেন, তাদের কাছ থেকে জীবনে অনেক কিছু শিখেছেন তা সহভাগিতা করেন। জোনাস গমেজ তার জীবনের অভিজ্ঞতা বলতে গিয়ে তার বৃদ্ধা মায়ের কথা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেন এবং বলেন আমরা যেন পিতা-মাতাকে কোনদিন কষ্ট না দিই বরং তাদেরকে ভালবাসা, শ্রদ্ধা-সম্মান করা, যত্ন করা প্রত্যেকজন সন্তানের দায়িত্ব। তিনি এখনো সুযোগ পেলে এবং সময় করে কী ভাবে বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, প্রবীণ ও রয়োজ্যেষ্ঠদের দেখতে যান, তাদের সুখ-দুঃখের কথা মনদিয়ে শোনেন তা সহভাগিতা করেন।

খ্রিস্টযাগের পর সাধ্বী বারবারা হলে দাদা-দাদী, নানা-নানী ও প্রবীণ দিবস উপলক্ষে তাদের গান, নৃত্যসহকারে ফুলের শুভেচ্ছা দেয়া হয়। সেই সাথে দুটি দৃশ্যের ছোট নাটিকায় দুটি পরিবারের বাস্তবচিত্র তুলে ধরা হয়। নাটিকা রচনা করেন মেজর সেমিনারীয়ান লিওন ক্রুশ এবং অনুষ্ঠানে সহযোগিতা করেন মেজর সেমিনারীয়ান শাওন রোজারিও এবং শিপ্রা দিদি। শেষে এই বিশেষ দিবস উপলক্ষে

উপস্থিত সকল দাদা-দাদী, নানা-নানী ও প্রবীণদের নিয়ে কেক কাটা হয় এবং সকলের মাঝে তা বিতরণ করা হয়। বিশেষ দিনের পবিত্র খ্রিস্টযাগে দাদা-দাদী, নানা-নানী ও প্রবীণ এবং নাতী-নাতনীসহ প্রায় ৬শত খ্রিস্টভক্ত উপস্থিত ছিলেন। অনেক নাতী-নাতনী তাদের দাদা-দাদা ও নানা-নানীকে মালা ও উপহার দিয়ে শুভেচ্ছা-অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। এই অনুষ্ঠানে ছোট-বড় সকলের অন্তরেই ছিল অনেক অনেক আনন্দ। সেদিনের গোটা অনুষ্ঠানই সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর পক্ষ থেকে অনলাইনে প্রচার করা হয়॥

নেতৃত্ব ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কর্মশালা ২০২২

বরেন্দ্রদূত ▯ গত ১৪-১৮ জুলাই ২০২২ খ্রিস্টাব্দ রাজশাহী যুব কমিশনের এর আয়োজনে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের ছেলে মেয়েদের নিয়ে নেতৃত্ব ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কর্মশালা ২০২২ এর আয়োজন করা হয়। উক্ত কর্মশালার মূলসুর ছিল "যুব নেতৃত্ব গঠনই, অংশগ্রহণকারী স্থানীয় মণ্ডলী গঠনের সোপান" এই প্রশিক্ষণ কর্মশালাই রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের বিভিন্ন ধর্মপল্লী থেকে মোট ৩৫ জন ছাত্র-ছাত্রী, ১জন ফাদার ও একজন ডিকন অংশগ্রহণ করেন। এই প্রশিক্ষণ কর্মশালার বিষয়গুলো হলো দায়িত্বশীল নেতা ও নেতৃত্বের ধারণা ও বৈশিষ্ট, পবিত্র বাইবেলের আলোকে নেতৃত্ব, ওয়ার্কশপ: নেতৃত্বের বাস্তবতা: সংকট ও সম্ভাবনা, Development Communication, Protection and safe guard ,Core Humanitarian standers, Facilitation Skill, SDG issues: Plan of Church & Government, Social Analzsis: Youth/Own Societz, এই বিষয়গুলোর উপর সহভাগিতা করা হয়।

রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের বিশপ জের্ভাস রোজারিও তার সমাপনী খ্রিস্টযাগ ও মূল্যায়ন ও মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে সমাপন করেন। তিনি যুবা সমাজকে বলেন, যুবারা তোমরাই মণ্ডলীর প্রাণ। 'আমাদের মণ্ডলীতে যুবাদের অনেক কাজ করার আছে, তাই যুব নেতৃত্বের বিষয়ে এই প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। বর্তমান যুগে পরিবার সমাজ মণ্ডলীতে পরিবর্তন আনতে যুবাদের নেতৃত্বদানের দক্ষতা অর্জন করতে হবে।'

এই প্রশিক্ষণের পরিচালক ফাদার সুরেশ পিউরীফিকেশন বলেন,'মণ্ডলীর ইতিহাসে ও বাইবেলের ইতিহাসে দেখি, ঈশ্বরের মনোনীত প্রবক্তাগণ মন পরিবর্তন, ন্যায্যতা শান্তির বাণী প্রচারে সাক্ষ্য বহন করে সঠিক নেতৃত্ব দিয়েছেন ঠিক একইভাবে আমাদেরকেও যোগ্য নেতা হিসেবে খ্রিস্টীয় নেতৃত্বদানের মাধ্যমে খ্রিস্টাদর্শ প্রচার করতে হবে।

অংশগ্রহণকারীদের মধ্য থেকে তরঙ্গ সরেন বলেন, 'আমরা মণ্ডলীর প্রতি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ কারণ মণ্ডলীর পক্ষ থেকে আমাদের জন্য এত গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশিক্ষণের আয়োজন করেছেন। আমরা এই প্রশিক্ষণের মধ্যদিয়ে অনেক কিছু শিখতে পেরেছি যা আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে, পরিবারে, সমাজে ও মণ্ডলীতে নেতৃত্বদানের জন্য সহায়ক হবে।

প্রশিক্ষণের সমাপনী অনুষ্ঠানে বিশপ জের্ভাস রোজারিও সার্টিফিকেট প্রদান করেন এবং প্রশিক্ষণে সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন॥

ঢাকা ক্যাটেনিয়ানস- এর মাসিক সার্কেল মিটিং

দিগন্ত গমেজ ▯ গত ২২ জুলাই, ২০২২ সন্ধ্যায় স্থানীয় এক রেঁস্তোরায় ঢাকা ক্যাটেনিয়ান্স এসোসিয়েশনের ৭৮তম মাসিক সার্কেল মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত মিটিং- এ নিজস্ব সদস্য ছাড়াও ফাদার ডনেল ক্রুশ সিএসসি, পাল-পুরোহিত, লক্ষীবাজার ধর্মপল্লী এবং কিছু দর্শনার্থী (ভিজিটর ও সদস্য হতে ইচ্ছুক) উপস্থিত ছিলেন। পবিত্র খ্রিস্টযাগের মধ্যদিয়ে এর কার্যক্রম শুরু হয়। বিশেষ প্রার্থনায় স্মরণ করা হয় এসোসিয়েশনের প্রয়াত আলফ্রেড রয় (প্রতিষ্ঠাতা সদস্য) এবং জন রেয়ার (প্রেসিডেন্ট, ইন্টারন্যাশনাল রিজিওনাল কাউন্সিল, গ্লোবাল ক্যাটেনিয়ান্স এসোসিয়েশন) কে। এরপর নির্ধারিত মাসিক সার্কেল মিটিং, রাতের খাবার এবং ঢাকা ক্যাটেনিয়ান্স এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট ইউজিন এস রিবেরু এর ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মধ্যদিয়ে দিনের কার্যক্রম সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

উল্লেখ্য যে, একটি অরাজনৈতিক এবং অ-আর্থিক আন্তর্জাতিক ক্যাথলিক প্রতিষ্ঠান "দি ক্যাটেনিয়ান এসোসিয়েশন" ঢাকায় তেজগাঁও, সাভারে ধরেন্ডা এবং খুলনায় মুজগুন্নি ধর্মপল্লীতে স্থানীয় পাল-পুরোহিতকে আধ্যাত্মিক পরিচালক হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করে ভিন্ন ভিন্ন সার্কেল গঠনের মাধ্যমে নিজস্ব কার্যকরী কমিটি দ্বারা স্বায়ত্বশাসিত ভাবে পরিচালিত হয়॥

ভবরপাড়া ধর্মপল্লীতে প্রতিবন্ধী ভাই-বোনদের বিশ্বাসের তীর্থযাত্রা- ২০২২

সেন্টু মন্ডল ▯ খুলনা ধর্মপ্রদেশ ও কারিতাস অঞ্চল এর আয়োজনে গত ২৪-২৫ জুন, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ, ধর্মপ্রদেশীয় প্রতিবন্ধী ভাই-বোনদের বিশ্বাসের তীর্থযাত্রা, ভবরপাড়া ধর্মপল্লীতে উদ্‌যাপন করা হয়। এই তীর্থ উৎসবের মূলসুর ছিল "প্রভুতে আনন্দ করো, আর নেই ভয়"। ভবরপাড়া ধর্মপল্লী ও কার্পাসডাঙ্গা ধর্মপল্লী থেকে প্রায় ৮০ জন প্রতিবন্ধী ভাই-বোনদের নিয়ে দেড় দিন ব্যাপী অনুষ্ঠানটি উদ্‌যাপিত হয়। ২৪ জুন বিকাল ৫টার সময় প্রতিবন্ধী ভাই-বোনদেরকে সমবেত করা হয়। পরে সন্ধ্যা ৬:৩০ মিনিটে মা-মারীয়ার গ্রোটোর সামনে মোমবাতি জ্বালিয়ে শোভাযাত্রা করে রোজারিমালা প্রার্থনা করা হয় এবং রাতে আহারের পর তাদেরকে নিয়ে বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানে আয়োজন করা হয়। ২৫ জুন সকাল ৬:৩০ মিনিটে প্রার্থনা অনুষ্ঠান করা হয়। সকাল ৯টার সময় দ্বিতীয় দিনের কার্যক্রম শুরু হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশপ জেমস্ রমেন বৈরাগী, খুলনা ধর্মপ্রদেশ, ফাদারগণ ও কারিতাসের কর্মকর্তাগণ। পবিত্র আত্মার গান ও প্রার্থনার মধ্যদিয়ে সেমিনারটি শুরু করা হয়। বিশপ জেমস্ রমেন বৈরাগী ও পাল-পুরোহিত ফাদার বাবুল বৈরাগীর শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদানের মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করা হয়। পরে বিশপ মহোদয় মূলসুরের ওপর সহভাগিতা করেন। প্রতিবন্ধী শিশুদের হাতের কাজ (গান শেখানো, আর্ট করা, ছবি আঁকা, কবিতা লেখা) করানো হয় এবং অভিভাবকদের জীবন সহভাগিতা ও আধ্যাত্মিক আলোচনা করা হয়। এরপর প্রতিবন্ধী ভাই-বোনদের মঙ্গল কামনা করে বিশপ মহোদয় পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন হয় ও কপালে নিরাময়কারী তৈল লেপন করে সকলকে বেলজিয়াম থেকে আনা মা-মারীয়ার আশ্চর্য মেডেল প্রদান করেন। দুপুরের আহারের পর প্রতিবন্ধী ভাই-বোনদেরকে বিশেষ উপহার প্রদানের মধ্য দিয়ে উক্ত সেমিনার সমাপ্ত হয়॥

JOB VACANCY

The Leprosy Mission International Bangladesh
dignity. inclusion. rights

The Leprosy Mission International-Bangladesh (TLMI-B) is a member of The Leprosy Mission (TLM) Global Fellowship which is an International Christian faith-based organization, committed to changing the lives of persons affected by leprosy. TLMI-B is working in Bangladesh since 1991 as a partner of the Government of Bangladesh to eliminate the cause and consequences of leprosy to achieve its vision "leprosy defeated, lives transformed". Currently, TLMI-B invites applications from the interested and eligible candidates for its DBLM Hospital Program, a 110 bedded leprosy referral hospital to fulfill the following position immediately.

Position: Residential Medical Officer(RMO)-1 , Job Location: Nilphamari.

Responsibilities:

- Responsible to provide supervison and technical support to Medical Officers and hospital medical staffs.
- Ensure smooth service & coordination of the hospital departments.
- Ensure proper medical care is provided to all admitted patient as per treatment guideline and medical ethics.
- Responsible to produce and monitor duty roster of Medical Officer including on call arrangements.
- Responsible to supervise and ensure daily care of inpatients with complications of leprosy such as differential diagnosis, reversal reaction, neuritis, ENL reaction, tropic ulcers, adverse effects of drugs, iritis, inter-current illness complicating leprosy, relapse. This includes minor surgery for infected ulcers.
- Organize & manage surgical/medical camps as required and planned in discussion with Program Leader.
- Facilitate any MOU with external local resource person for hospital service.
- Responsible for capacity building of medical team through on job or external training.
- Assist in producing annual/multi-year plan for the hospital.
- Support the medicine procurement process as member of of local procurement team.
- Take active role as member of Hospital Management Committee and execute decision accordingly.
- Reponsible for data collection, analyize and support periodical reports.
- Responsible to supervise the procedures of out patient departments.
- Regular ward rounds with colleagues.
- Provide support and supervision in OT management, pre and post operative care as necessary.
- The RMO will share on call duties (nights and weekends and public holidays) with other Medical Officers.

Job Requirements:

- MBBS with valid BMDC registration and having 4-6 years' Experience working in similar posion. Experience on Leprosy work would add extra value to the candidacy.
- Diploma in Hospital Management & Proven experience in manging small or mediam level hospital at least 3-5 years. Experience of working as a general or Orthopedic Surgeon will be treated as an advantage.
- Proven experience in project planning , managing, coordinating and report writing skills
- Experienced in working in cooperation with local GOB health services, referral agencies and other partner NGOs would be an advantage.
- Dynamic and positive team player. Creative and good problem solving ability.
- Ability to manage out patient department.
- A commitment to organization's vision, mission, values and work with and for people affected by leprosy, disability, and socially excluded.

Salary & benefits: Gross Monthly Salary and fixed allowances BDT 74,400.00 plus other benefits as per TLMI-B policy.

How to Apply: The eligible candidates are requested to send an email along with a cover letter, updated CV including a recent Passport size photograph, two referees (one must be the present Supervisor), and copies of the latest academic certificates to HR.Manager@TLMBangladesh.org on or before 16 August, 2022. Please write the name of the 'Position' you are applying for at the subject head of your email. Only short-listed candidates will be called for an interview. Any personal persuasion/contact will be treated as disqualification.

The Leprosy Mission International Bangladesh has a zero-tolerance policy toward any abuse, neglect, and exploitation of all people. Successful candidates will be subject to reference and background checks as well as expected to sign and comply with TLMIB's all organizational policies, including the TLMIB Safeguarding Code of Conduct and the Safeguarding Children & Vulnerable Adults Policy.

বিজ্ঞ/২১৬/২২

তুমি রবে নীরবে হৃদয়ে মম

প্রয়াত নিকোলাস গ্রেগরী গমেজ

জন্ম: ৩ জুলাই, ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দ

মৃত্যু: ২ আগস্ট, ২০০৯ খ্রিস্টাব্দ

আমাদের আশা ও বিশ্বাস তুমি
স্বর্গে পরম পিতার সাথেই আছ।

সময়ের স্রোতে বছর ঘুরে ফিরে এলো সেই বেদনাসিক্ত দিন। যেদিন মহাশান্তির মাঝে পরম পিতার কোলে তুমি আশ্রয় নিয়েছ। তুমি চলে গেছ, তবু রেখে গেছ অনেক কিছু স্মৃতির মানসপটে।

তোমার সদালাপী হাস্যোজ্জ্বল মুখ আমাদের অনুপ্রেরণা ও সাহস যোগায়, তোমার অপরিসীম ভালবাসা, স্নেহ, যত্ন সর্বোপরি তোমার আদর্শ ও দিক-নির্দেশনা বরাবরই আমাদের মানসপটে ভেসে ওঠে এবং আমাদের নব চেতনায় উদ্ভাসিত করে।

আশীর্বাদ কর, আমরা যেন তোমার আদর্শ, নম্রতা, ত্যাগ ও কর্মময় জীবন অনুসরণ করে সকল কাজে পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারি।

পরম করুণাময়ের কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন তোমার আত্মাকে চিরশান্তি দান করেন।

শোকার্ত পরিবারের পক্ষে

স্ত্রী : মেরী গমেজ
পুত্র ও পুত্রবধূ : প্রদীপ-লিলি, প্রবীন-রিটা, প্রতাপ-শিপ্রা, প্রকাশ- সেন্ড্রা, বিকাশ- জেসি, সিজার-অর্পিতা।
নাতি-নাতনী : অংকন, আপন, আবৃত্তি, অরিন, চড়া, ইরা, অরিত্র, লিরা, অর্কিত, এরভিন, অক্ষর, আদিপ্ত্য, এনড্রিক আরোহী, আরিয়েন।
ধরেণ্ডা, সাভার, ঢাকা।

বিজ্ঞ/২১৩/২২

বর্ষ ৮২ ❖ সংখ্যা - ২৮
THE WEEKLY PRATIBESHI
বর্ষ ৮২ ❖ সংখ্যা - ২৮
Regd. No. DA-33
❖ 7 - 13 August, 2022, ২৩ - ২৯ শ্রাবণ, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

প্রয়াত ফাদার আলফ্রেড গমেজ-এর ১ম মৃত্যুবার্ষিকী

মর্তলোকের চিঠি

আলো ফোটে আধাঁর নামে দিনের পরে দিন গত হয়,
মাসের পর মাস চক্রাকারে আবর্তিত হয় ষড়ঋতু।

পি এইচ বি'র সবুজ শ্যামল প্রান্তর জুড়ে সোনালী শস্য শিরে, মানুষের সঙ্গে জলে-স্থলে-নভোনীলে, দিবস ও রাতে ষড়ঋতুর রং খেলাতে মৃদু হাওয়ায় মিশে আছো তুমি প্রতিটি মানুষের অন্তরে। এভাবে পাড়ি জমালে একটি বছর। কে বলে আজ তুমি নেই?

আলোয় আলোয় আলোকিত হোক
তোমারই পূণ্যধাম
আশীর্বাদ করো তোমার আদর্শে যেন পথ চলতে পারি।

প্রয়াত ফাদার আলফ্রেড গমেজ
জন্ম : ৫ মার্চ ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দ
গ্রাম : পিপ্রাশৈর গোছালবাড়ী, তুমিলিয়া ধর্মপল্লী
কালীগঞ্জ, গাজীপুর।
সেমিনারীতে প্রবেশ : ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দ
ডিকন পদ লাভ : জুন ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দ
যাজকত্ব বরণ : ২৯ ডিসেম্বর ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ১০ আগস্ট ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

সৌজন্যে: ফাদার আলফ্রেড বৃত্তি তহবিল
পি এইচ বি খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ
পি এইচ বি, কালিগঞ্জ, গাজীপুর।

বিজ্ঞ/২১৫/২২

পাওয়া যাচ্ছে! বাণীবিতান, প্রার্থনাবিতান, পানপাত্র ও ছোট ক্রুশ

- ❐ বাণী বিতান দৈনিক পাঠ (৩,২০০/= টাকা)
- ❐ বাণী বিতান রবিবাসরীয় (২,৫০০/= টাকা)
- ❐ খ্রিস্টযাগের প্রার্থনা সংকলণ (৩,০০০/= টাকা)

এছাড়াও পাওয়া যাচ্ছে

- ❐ খ্রিস্টযাগ রীতি
- ❐ খ্রিস্টযাগ উত্তরদানের লিফলেট
- ❐ ঈশ্বরের সেবক থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর বই
- ❐ কাথলিক ডিরেক্টরী
- ❐ এক মলাটে নির্বাচিত কলামগুচ্ছ
- ❐ যুগে যুগে গল্প
- ❐ সমাজ ভাবনা
- ❐ প্রণাম মারীয়া : দয়াময়ী মাতা
- ❐ বাংলাদেশে খ্রীষ্টমণ্ডলীর পরিচিতি
- ❐ খ্রিস্টমণ্ডলী ও পালকীয় কর্মকাণ্ড (১ম ও ২য় খণ্ড)
- ❐ বাংলাদেশে খ্রিস্টধর্ম ও খ্রিস্টমণ্ডলীর ইতিকথা
- ❐ সাধু যোসেফ পরিবারের রক্ষক ও বিশ্বমণ্ডলীর প্রতিপালক
- ❐ সলতে
- ❐ ছোটদের সাধু-সাধ্বী

অতিসত্ত্বর যোগাযোগ করুন

-যোগাযোগের ঠিকানা -

খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র	প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)	প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)	প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ লক্ষীবাজার, ঢাকা-১১০০ ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫	হলি রোজারি চার্চ তেজগাঁও, ঢাকা	সিবিসিবি সেন্টার ২৪/সি আসাদ এভিনিউ, মোহম্মদপুর, ঢাকা	নাগরী পো: অ: সংলগ্ন গাজীপুর।

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org